পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক অনুমোদিত ১৯৭৪ সনের নূতন সিলেবাস অনুসারে দশম শ্রেণীর জন্য লিখিত।

[পর্ষদের ১৮-৭-৭৩ তারিখের ১০০১৫/সি পত্র দ্রষ্টব্য]

জীবন-বিজ্ঞান

[১০-ম শ্রেণী]

অধ্যাপক এন মল্লিক, এম. এস. সি
বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান বিভাগ
আশুতোষ কলেজ, কলিকাতা—২৬

সরকার প্রদত্ত কাগজে মুদ্রিত

· মল্লিক

নিউ বুক এজেন্সি
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

প্রকাশক ঃ
শ্রীহেমচন্দ্র বিশ্বাস
১৮-বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০১২

নূতন সংস্করণ ঃ
জানুয়ারী, ১৯৭৫

মূল্য ঃ চার টাকা কুড়ি পয়সা

রী

চন্দ্র বসু রোড

ছাত্রছাত্রীদের প্রতি

আমার লেখা নবম শ্রেণীর জীবন-বিজ্ঞান তোমাদের মনে যে সাড়া জাগাতে পেরেছে তার জন্য নিজেকে ধন্য মনে করছি। তোমাদের সকলের জন্য রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। **নতুন উৎসাহ নিয়ে আজ তাই লিখতে বসেছি** দশম শ্রেণীর জীবন-বিজ্ঞান।

দশম শ্রেণীতে জীবন-বিজ্ঞানের সংগে আমাদের প্রাথমিক পরিচয়ের পালা শেষ হবে। জীবন-বিজ্ঞানের 'না-বলা বাণীর' সবটুকু বলা হলে বুঝতে পারবে এর স্বরূপকে এবং আমাদের জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা কতখানি।

সূর্য সকল শক্তির উৎস। সূর্যের সংগে উদ্ভিদ ও প্রাণীযগত একসূত্রে বাঁধা। আবার জীবজগতের ছোট বড় সকল জীব একে অন্যের সংগে কোন না কোন সম্পর্কে জড়িত। এর সংগে আছে প্রত্যেকের নিজ নিজ পরিবেশ। পরিবেশের সজীব বস্তু ছাড়া বায়ু, জল, মৃত্তিকা নানাভাবে জীবের উপকার সাধন করে চলেছে। এই শৃঙ্খলের কোথাও যদি ছেদ পড়ে তবে জীবনের গতি হয়ে যাবে স্তিমিত, এমন কি পৃথিবী হতে জীবনের অস্তিত্ব মুছে যাওয়া বিচিত্র নয়।

শক্তি সূর্য হইতে উদ্ভিদ এবং উদ্ভিদ হইতে প্রাণীতে প্রবেশ করে। জীব-জগতের যাবতীয় কার্যের মূলে রহিয়াছে সৌরশক্তির খেলা। এই পুস্তকের প্রচ্ছদপটে সূর্যের সংগে জীবজগতের সম্পর্ক রূপায়িত করা হইয়াছে।

এই পুস্তকে দুরূহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে সহজ মাতৃভাষায়, ছবি সহযোগে তোমাদের সামনে উপস্থাপিত করা হল। এই পুস্তক পাঠে জীবন সম্পর্কে যদি তোমাদের স্পষ্ট ধারণা জন্মায় তবে আমার পরিশ্রম সার্থক বলিয়া জানিব।

রথযাত্রা
১৩৮১ সাল

এন· মল্লিক

SYLLABUS IN LIFE SCIENCE

CLASS X

1. Introduction to Nervous system and Sense organs (*Detailed description not required*).
2. General idea about Hormones.
3. Cell division and its significance—mitosis and meiosis (*outline stages only*) detail not required.
4. Growth and reproduction.
5. Heredity (*outline idea only illustrating simple inheritance*).
6. Evolution (*outline idea*).
7. Adaptations as exemplified by specimens mentioned in the course content.
8. Carbon cycle, Nitrogen cycle and Oxygen cycle.
9. General idea about Eco-system and Conservation.
10. Students should acquire individual experience by experimentation on the following items :—

    Experiments to show growth, Phototrophic movement and Geotropic movement.

    TOAD— excretory system and male reproductive system. Heart and arterial arches.

N.B. — A class Note-Book should be maintained which should be illustrated with accurate Diagrams. The main idea of holding demonstration and experimental classes is to initiate a training in observation and inference.

সূচীপত্র

১

নার্ভ তন্ত্র ও সংজ্ঞাবহ ইন্দ্রিয়

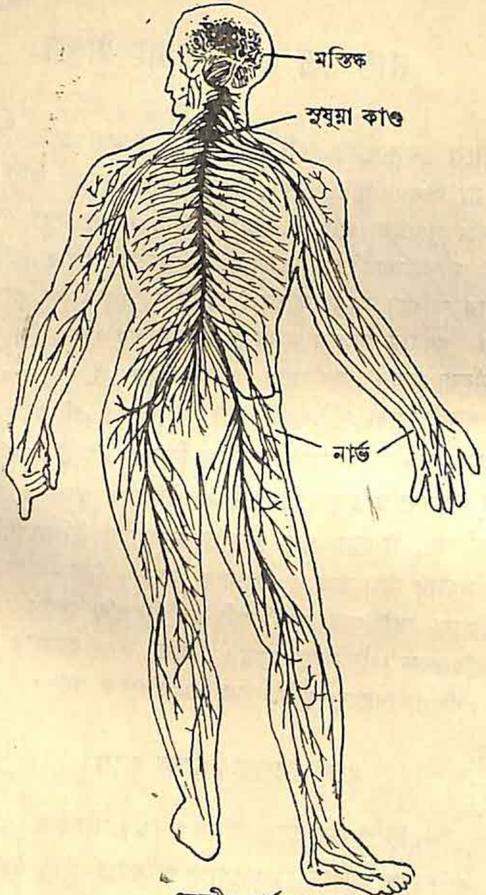
মাঠে ময়দানে খেলাধুলা করিবার সময়ে আমরা হাত দিয়া বল ধরি বা ছুঁড়ি; পা দিয়া অথবা ব্যাট দিয়া ঠিক সময়ে আঘাত করি। আগুণে হাত লাগিলে তৎক্ষণাৎ সরাইয়া লই। কথা বলিবার সময়ে মুখে পর পর কথাগুলি চলিয়া আসে। মাথা ঘামাইয়া নিজে হাতে অনেক শখের জিনিস তৈরী করি। ভাল মন্দ বিচার করিয়া কার্য করিতে পারি। একসংগে অনেক জিনিস মনে রাখিতে পারি। আবার দেহের মধ্যে দেখ, আন্তর যন্ত্রগুলি নিয়ম মত আপন আপন কার্য করিয়া যায়। হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হয়, ফুসফুস সঙ্কুচিত প্রসারিত হয়, পৌষ্টিক নালী খাদ্য পরিপাক করে। দেহের এই যাবতীয় কার্য কেমন করিয়া সম্ভব হয় জান? আমাদের দেহের ভিতর একটি নার্ভ তন্ত্র আছে যাহা দেহের প্রত্যেক অংশের সহিত যুক্ত থাকিয়া উহাদের কাজকর্ম পরিচালনা করে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বক প্রভৃতি সংজ্ঞাবহ ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে এই তন্ত্রটি যেরূপ সংবাদ পায় তাহার ভালমন্দ বিচার করিয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পেশী ও দেহযন্ত্রগুলিকে সেই মত কার্য করিবার নির্দেশ দেয়। আমাদের চিন্তা-শক্তির মূলে রহিয়াছে এই নার্ভ তন্ত্র। নার্ভ তন্ত্র রাজ্যের শাসনকর্তার মত সর্বদা সজাগ থাকিয়া দেহকে পরিচালনা ও তদারক করে।

নার্ভ তন্ত্রের বিভিন্ন অংশ

নার্ভ তন্ত্রে তিনটি প্রধান অংশ আছেঃ (১) মস্তিষ্ক (২) সুষুম্না কাণ্ড (৩) নার্ভ। বাহিরের সহিত যোগাযোগ রাখিবার জন্য ইহার সহিত পাঁচটি প্রধান ইন্দ্রিয়স্থান যুক্ত আছে। যেমন—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা ও ত্বক।

মস্তিষ্ক অনেকটা জমাট ঘৃতের মত এবং মাথার খুলির মধ্যে থাকে। আমাদের মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া ছোট ছোট হাড় বা কশেরুকার দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক কশেরুকায় একটি গর্ত থাকায় শিরদাঁড়ার ভিতরে লম্বা নলের মত একটা ফাঁপা জায়গা থাকে। এই ফাঁপা নলের মধ্যে সুষুম্না কাণ্ড থাকে। মাথার খুলি ও মেরুদণ্ড কঠিন হওয়ায় মস্তিষ্ক ও সুষুম্না কাণ্ডকে বাহিরের আঘাত হইতে রক্ষা করে। মস্তিষ্ক ও সুষুম্না কাণ্ড হইতে সাদাটে রঙের সরু সুতার

মত অসংখ্য নার্ভ বাহির হয়। নার্ভগুলি শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পেশী, ইন্দ্রিয় স্থান, অন্তগ্রন্থি ও দেহের অন্যান্য অংশে ছড়াইয়া পড়ে। নার্ভ সমেত মস্তিষ্ক ও সুষুম্না কাণ্ড একত্রে **কেন্দ্রীয় নার্ভ তন্ত্র** গঠন করে।



কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র

মানব দেহের সকল অংশ নার্ভের মাধ্যমে মস্তিষ্ক ও সুষুম্না কাণ্ডের সহিত যুক্ত থাকে।

মস্তিষ্কের প্রধান অংশ কি কি?

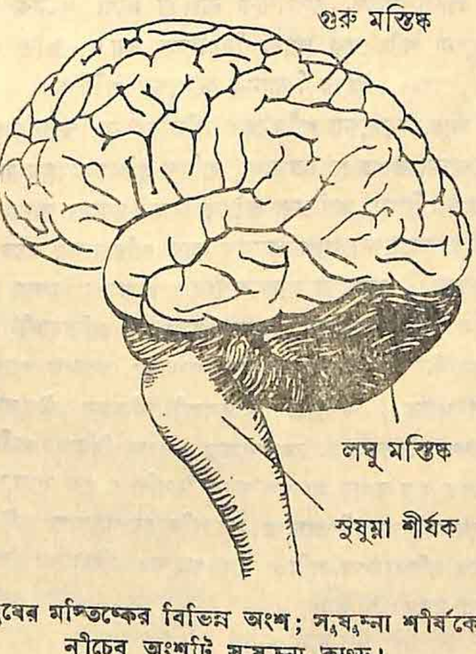
আমাদের মস্তিষ্কে তিনটি প্রধান অংশ আছে—**গুরু মস্তিষ্ক লঘু মস্তিষ্ক এবং সুষুম্না শীর্ষক।**

মস্তিষ্কের উপর দিকে সবচেয়ে বড় অংশটি গুরু মস্তিষ্ক। ইহা দক্ষিণ

ও বাম গোলার্ধে বিভক্ত এবং খুলির সামনে দিক হইতে পিছন দিক পর্যন্ত বিস্তৃত। গুরু মস্তিষ্কের বহির্ভাগ ধূসর বর্ণের নার্ভ কলা ও নীচের স্তর সাদা নার্ভ কলা দ্বারা গঠিত। গুরু মস্তিষ্কের ধূসর কলার স্তরটি আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, চেতনা, বিচার বুদ্ধি ও স্মৃতির প্রাণকেন্দ্র। তাহা ছাড়া আমরা যাহা কিছু দেখি, শুনি অথবা ঘ্রাণ লই তাহা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করি এই কেন্দ্রের সাহায্যে।

মেরুদন্ডী প্রাণীর মধ্যে মানুষের গুরু মস্তিষ্ক সব চেয়ে উন্নত। সেই কারণে, মানুষ অপেক্ষা বলবান, দ্রুতগামী জীব থাকিলেও বুদ্ধিবলে মানুষ সকলকে পরাস্ত করিয়াছে। উদ্ভাবনীশক্তির অধিকারী হওয়ায় মানুষ আবিষ্কার করিয়াছে বিজ্ঞানকে।

গুরু মস্তিষ্কের পিছনদিকে এবং নীচে লঘু মস্তিষ্ক অবস্থান করে। ইহা গুরু মস্তিষ্ক অপেক্ষা অনেক ছোট এবং উহার মত দুই গোলার্ধে বিভক্ত নহে। লঘু মস্তিষ্ক দেহের অংগ প্রত্যংগ চলনের নিয়ামক। আমরা যখন দৌড়াই, সাঁতার কাটি বা বল ছুঁড়ি, কার্যরত অবস্থায় প্রতি মুহূর্তে বিভিন্ন



মানুষের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ; সুষুম্না শীর্ষকের নীচের অংশটি সুষুম্না কান্ড।

পেশীতে বিভিন্ন রকমের টান পড়ে। কোন পেশী সংকুচিত কোনটি বা প্রসারিত হয়। পেশীগুলি ঠিক ঠিক সময়ে সংকুচিত প্রসারিত হইয়া আমাদের কাজের সহায়ক হইয়া উঠে। প্রত্যেক পেশীর সংগে নার্ভ যুক্ত থাকে। লঘু মস্তিষ্ক

নার্ভ পথে পেশীগুলির কোনটি কিভাবে কার্য করিবে তাহার নির্দেশ দেয়। কোন পেশীতে যদি ঠিক সময়ে নির্দেশ আসিয়া না পোঁছায় তবে উহা অস্থায়ী-ভাবে অকেজো হইয়া পড়ে। দ্রুত বল ছুঁড়িবার সময়ে হঠাৎ হাতে টান পড়ে এই কারণে। জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব লঘু মস্তিষ্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না।

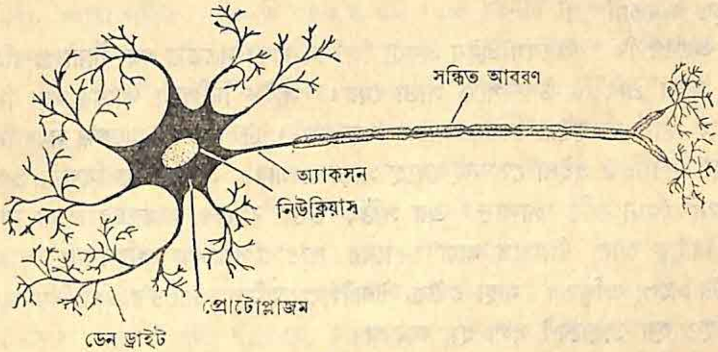
মস্তিষ্কের একেবারে নীচের অংশকে বলা হয় সুষুম্না শীর্ষক। ইহা মস্তিষ্ককে সুষুম্না কান্ডের সহিত যুক্ত করে। সুষুম্না শীর্ষক অনেকগুলি দৈহিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। ইহার একটি অংশ শ্বাস প্রশ্বাসের নিয়ামক। সুষুম্না শীর্ষকের এই কেন্দ্রটি যদি কোন কারণে বিনষ্ট হয় তবে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে। ইহার অপর এক অংশ রক্তনালীর দেওয়ালের পেশীগুলি নিয়ন্ত্রণ করে। যদি পেশীগুলি অধিক মাত্রায় সংকুচিত হয় তবে রক্তনালীর ব্যাস কমিবে এবং দেহে রক্তচাপ বৃদ্ধি পাইবে। পেশীগুলি প্রসারিত হইলে রক্তনালীর ব্যাস বাড়িবে এবং দেহে রক্তচাপ কমিয়া যাইবে। খাদ্য চর্বন, চোষণ, পৌষ্টিক নালীর ক্রম সংকোচ নিয়ন্ত্রিত হয় অন্যান্য অংশের দ্বারা। লালা-গ্রন্থি হইতে লালা ক্ষরণ, পৌষ্টিক নালীর মধ্যে কয়েক প্রকার জারক রস নিঃসরণ সুষুম্না শীর্ষকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রতি মুহূর্তে আমাদের চোখের পাতা পড়ে। ইহার নিয়ামক সুষুম্না শীর্ষক।

সুষুম্না কান্ড সুষুম্না শীর্ষকের নীচ হইতে শিরদাঁড়ার শেষভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। সুষুম্না কান্ড হইতে নার্ভ বাহির হইয়া দেহের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে, কেবল যে অংশগুলিতে মস্তিষ্ক হইতে নার্ভ আসে, তথায় সুষুম্না কাণ্ডের নার্ভ থাকে না। সুষুম্না কাণ্ড অনেক কার্য পরিচালনা করে। ইহা প্রতিবর্তী ক্রিয়াগুলির কেন্দ্র। আগুণে হাত লাগিলে কিছু বুঝিবার পূর্বে হাতটি দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরিয়া আসে। ইহাকে বলা হয় **প্রতিবর্তী ক্রিয়া**। স্থিরভাবে বসিয়া থাকিলে নিজের অজান্তে, অভ্যাশবশতঃ অনেকে পা নাড়ে বা পড়িবার সময় দুলিতে থাকে। এগুলি প্রতিবর্তী ক্রিয়ার উদাহরণ। এই ধরণের বিচলনের সঙ্গে মস্তিষ্কের যোগাযোগ প্রথম দিকে থাকিলেও, উহা যখন অভ্যাসে পরিণত হয় তখন সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় সুষুম্না কাণ্ডের দ্বারা। যে নার্ভগুলির সহিত মস্তিষ্কের সরাসরি যোগাযোগ নাই সেগুলি সুষুম্না কাণ্ডের মাধ্যমে মস্তিষ্কের সহিত যুক্ত থাকে। উহাদের ক্ষেত্রে সুষুম্না কাণ্ড যোজকের কাজ করে।

নার্ভ কোষ নার্ভ তন্ত্র গঠন করে

দেহের অন্যান্য অংশের মত নার্ভ তন্ত্র অসংখ্য নার্ভ কোষ দ্বারা গঠিত। নার্ভ কোষকে বলা হয় **নিউরন**। নিউরন সাধারণ কোষের মত নহে। কোষের

কোন নির্দিষ্ট আকার নাই। কোষের মধ্যে যথারীতি নিউক্লিয়াস ও প্রোটোপ্লাজম আছে। তবে কোষের বিভিন্ন দিক হইতে প্রোটোপ্লাজম সুতার আকারে বর্ধিত হয়। সুতাগুলির মাথা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নার্ভ কোষের একধারে থাকে ছোট শাখান্বিত অনেকগুলি সুতা এবং আর একধারে একটি লম্বা সুতা। লম্বা সুতাটি সন্ধিত আবরণে ঢাকা। ছোট সুতাগুলিকে **ডেনড্রাইট** এবং লম্বা সুতাকে **অ্যাকসন** বলা হয়। উত্তেজনা ডেনড্রাইট দিয়া নার্ভ কোষে প্রবেশ করে এবং অ্যাকসন দিয়া বাহির হইয়া যায়।



নিউরন বা নার্ভকোষ

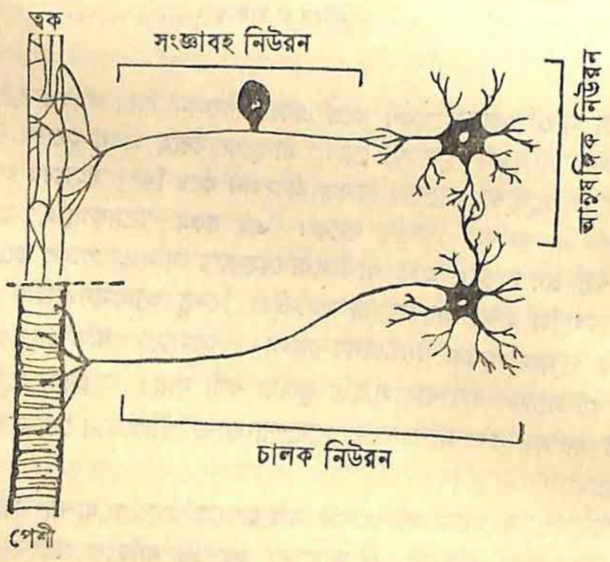
অনেক সময়ে অ্যাকসন খুব বড় হয়। মানুষের দেহে এমন অনেক নার্ভকোষ আছে যেগুলি সুষুম্না কাণ্ডের ভিতর অবস্থান করে কিন্তু ইহাদের অ্যাকসনটি হাত কিংবা পা পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। এই রকম অনেকগুলি অ্যাকসনের গোছাকে বলা হয় নার্ভ। হাত পা কিংবা দেহযন্ত্রে যে নার্ভ প্রবেশ করে আসলে উহা অনেকগুলি লম্বা অ্যাকসনের সমষ্টি। কিন্তু অ্যাকসনগুলির প্রত্যেকটি যুক্ত থাকে পৃথক পৃথক নিউরনের সঙ্গে। আমাদের নার্ভতন্ত্রকে সহরের স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন ব্যবস্থার সহিত তুলনা করা যায়। অ্যাকসনগুলি টেলিফোন লাইনের মত এবং মস্তিষ্ক ও সুষুম্না কাণ্ড টেলিফোন কেন্দ্রের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মত।

নার্ভকোষগুলি থাকে মস্তিষ্কের বহিরাঞ্চলে এবং সুষুম্না কাণ্ডের মধ্যভাগে। ইহা ছাড়া মস্তিষ্ক ও সুষুম্না কাণ্ডের বাহিরে দেহের নানাস্থানে নার্ভকোষগুলি দল বাঁধিয়া অবস্থান করে। নার্ভকোষের দল বা সমষ্টিকে **গ্যাংগ্লিয়ন** বলা হয়। অ্যাকসনগুলি থাকে সুষুম্না কাণ্ডের বাহিরের দিকে, মস্তিষ্কের ভিতরাঞ্চলে এবং দেহের মধ্যে নার্ভরূপে। দেখা যাইতেছে মস্তিষ্কের বহিরাঞ্চলে থাকে নার্ভকোষ ও ভিতরাঞ্চলে অ্যাকসন এবং সুষুম্না কাণ্ডের ভিতর দিকে থাকে নার্ভকোষ, বাহিরের দিকে অ্যাকসন।

নার্ভগুলি আবেগ বহন করে

বস্তুর উপর আলোক পড়িলে আমরা উহা চোখ দিয়া দেখিতে পাই, শব্দ আসিলে কান দিয়া শুনিতে পাই। ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হয়? নার্ভ-কোষ বা নিউরন এমন এক বিশেষ ধরণের কোষ যাহা বাহিরের উদ্দীপক আসিলে নিজের মধ্যে আবেগ সৃষ্টি করিতে পারে এবং সেই আবেগকে তৎক্ষণাৎ মস্তিষ্কে বা সুষুম্না কাণ্ডে পাঠাইয়া দিতে পারে। নার্ভ কোষের এ এক বড় অদ্ভুত ক্ষমতা।

আবেগ কি? আবেগ এমন একটা জিনিস যাহা নার্ভের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। ফলে প্রাণীটি উদ্দীপকে সাড়া দেয়। সুইচ টিপিলে তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইয়া যেমন আলো জ্বালায়, ঘণ্টা বাজায়, নার্ভের মধ্য দিয়া আবেগ প্রবাহিত হইয়া তেমনই দেহে সাড়া জাগায়। আবেগ কি বিদ্যুৎ তরঙ্গ না অন্য কোন শক্তি তরঙ্গ? এর সঠিক উত্তর আজও আমাদের জানা নাই। তবে এটুকু জানা গিয়াছে নার্ভ কোষের দ্রুত রাসায়নিক পরিবর্তন আবেগ সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত। যাহা হউক, উদ্দীপক আসিলে নার্ভের মধ্য দিয়া যাহা প্রবাহিত হয় তাহাকেই বলা হয় আবেগ।



আবেগের প্রবাহ-পথ একটি একমুখী রাস্তার মত। আবেগ ত্বক হইতে সুষুম্না কাণ্ডে এবং সুষুম্না কাণ্ড হইতে পেশীতে চলিয়া যায়। প্রবাহ-পথে খুব কম পক্ষে তিনটি নিউরন থাকে।

আমাদের এই জটিল নার্ভ তন্ত্রে আবেগ পরিবহনের জন্য অসংখ্য রাস্তা আছে। শিশুকালে ইহাদের সংখ্যা কিছু কম থাকে এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে

সঙ্গে বাড়িতে থাকে। প্রত্যেকটি রাস্তার তিনটি অংশ আছে। প্রথম অংশ আবেগকে উত্তেজিত স্থান হইতে মস্তিষ্ক বা সুষুম্না কাণ্ডে লইয়া যায়। দ্বিতীয় অংশ মস্তিষ্ক বা সুষুম্না কাণ্ডের মধ্যে থাকে। ইহার মধ্য দিয়া আবেগ তৃতীয় অংশে চলিয়া যায়। তৃতীয় অংশটি মস্তিষ্ক বা সুষুম্না কাণ্ড হইতে বাহির হইয়া পেশী, অন্তগ্রন্থি বা অন্যান্য যন্ত্রে প্রবেশ করে।

আবেগ পরিবহনের জন্য তিন ভাগে ভাগ করা যে রাস্তার কথা বলা হইল তাহা নিউরন দ্বারা গঠিত। একটি রাস্তায় কম পক্ষে তিনটি নিউরন থাকে—একটি অন্তর্গামী, একটি বহির্গামী এবং এই দুয়ের যোজক হিসাবে তৃতীয়টি। অন্তর্গামী নিউরন সংজ্ঞাবহ ইন্দ্রিয়গুলি হইতে আবেগ গ্রহণ করে বলিয়া ইহাদের বলা হয় **সংজ্ঞাবহ নিউরন**। বহির্গামী নিউরন পেশী বা দেহ-যন্ত্রকে চালনা করে বলিয়া ইহাদের বলা হয় **চালক নিউরন**। যে নিউরন ইহাদের যুক্ত করে তাহাকে **আনুষঙ্গিক নিউরন** বলা হয়।

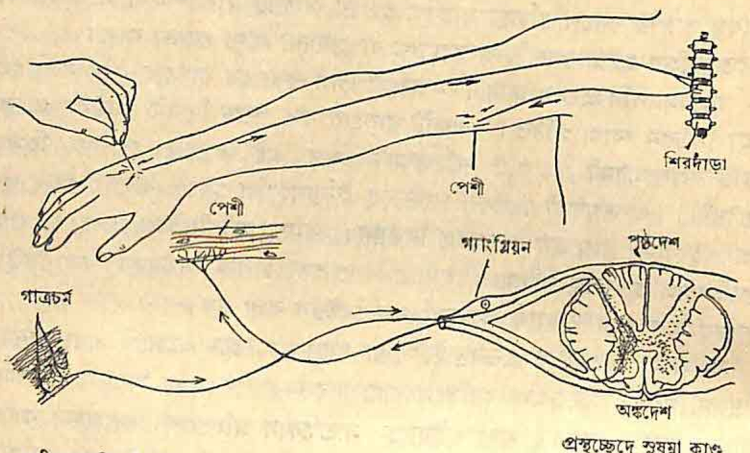
সংজ্ঞাবহ নিউরনের ডেনড্রাইটগুলি থাকে গাত্রচর্মে, চোখে এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিতে। উত্তেজনা আসিলে আবেগ ডেনড্রাইটের মধ্য দিয়া নার্ভ কোষে চলিয়া আসে। পূর্বেই বলা হইয়াছে **নার্ভকোষ** মস্তিষ্কে, সুষুম্না কাণ্ডে অথবা নার্ভ যেখানে সুষুম্না কাণ্ডে প্রবেশ করে, সেই নার্ভ-মূলে থাকিতে পারে। আবেগ নার্ভকোষের **অ্যাকসন** বাহিয়া মস্তিষ্কে অথবা সুষুম্না কাণ্ডে আনুষঙ্গিক নার্ভ কোষে চলিয়া আসে। শেষোক্ত নার্ভ কোষ হইতে আবেগ চালক নিউরনে আসিয়া পেঁৗছায় এবং তথা হইতে পেশীতে গমন করে ও সাড়া জাগায়। আবেগের প্রবাহ-পথ একটি একমুখী রাস্তার মত।

আবেগ তিনটি নার্ভ কোষের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইলেও নার্ভ কোষ তিনটি একটি অপরটির সহিত সরাসরি যুক্ত থাকে না। প্রথম নার্ভ কোষের অ্যাকসনের প্রান্তভাগ পরের নার্ভকোষের ডেনড্রাইটগুলির মধ্যবর্তী স্থানগুলিতে শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু উহার সহিত যুক্ত হয় না। ঐ স্থানে আবেগটি যেন প্রথম কোষের অ্যাকসন হইতে দ্বিতীয় কোষের ডেনড্রাইটে লাফাইয়া চলিয়া আসে। আসলে ঐ অঞ্চলে রাসায়নিক পরিবর্তন আবেগকে এক কোষ হইতে পরবর্তী কোষে লইয়া যায়।

প্রতিবর্তী ক্রিয়া

প্রতিবর্তী ক্রিয়া কি তাহা আগে বলা হইয়াছে। প্রতিবর্তী ক্রিয়ার মধ্যে অনেকগুলি মানুষকে আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করে। গরম জিনিসে হাত লাগিলে বা হাতে পিন ফুটিলে হাতের পেশী নিমেষে সংকুচিত হইয়া উহাকে বিপদমুক্ত করে। সংজ্ঞাবহ নিউরনের ডেনড্রাইট থাকে গাত্রচর্মের মধ্যে। আবেগ ইহার মধ্য দিয়া গ্যাংগ্লিয়নের নার্ভকোষে চলিয়া আসে। এই নার্ভ-

কোষটির অ্যাকসন শিরদাঁড়ার পিছনদিক দিয়া সুষুম্নাকাণ্ডে প্রবেশ করে ও উহার মধ্যে নার্ভকোষগুলিতে আবেগ হস্তান্তর করে। পরিশেষে সুষুম্না-কাণ্ডস্থিত নার্ভকোষের অ্যাকসন শিরদাঁড়ার সামনে দিক দিয়া বাহির হইয়া



প্রতিবর্তী ক্রিয়ায় আবেগের প্রবাহ পথ। গাত্রচর্মে উদ্দীপক আসিলে বাহুর পেশী দ্রুত সঙ্কুচিত হইয়া হাতকে টানিয়া লয়।

হাতের পেশীতে প্রবেশ করে এবং উহার মধ্যে প্রবাহিত আবেগ পেশীর সঙ্কোচন ঘটায়। তখন হাত সরিয়া আসে।

হাঁচি, কাসি, চোখের পাতা পড়া, এগুলি প্রতিবর্তী ক্রিয়ার উদাহরণ। পা পিছলাইয়া পড়িয়া যাইবার সময়ে হাত দুইটি আপনা হইতে উপরে উঠিয়া যায়। হঠাৎ কোন বিপদ আসিলে হাত, পা, মাথা সরাইয়া লই বা লাফাইয়া উঠি। এই প্রতিবর্তী ক্রিয়াগুলি আমরা কিছু বুঝিবার পূর্বেই ঘটিয়া যায়। ঘটিয়া গেলে তখন বুঝিতে পারি। নার্ভের মধ্য দিয়া আবেগের গতি প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৪০০ ফুট।

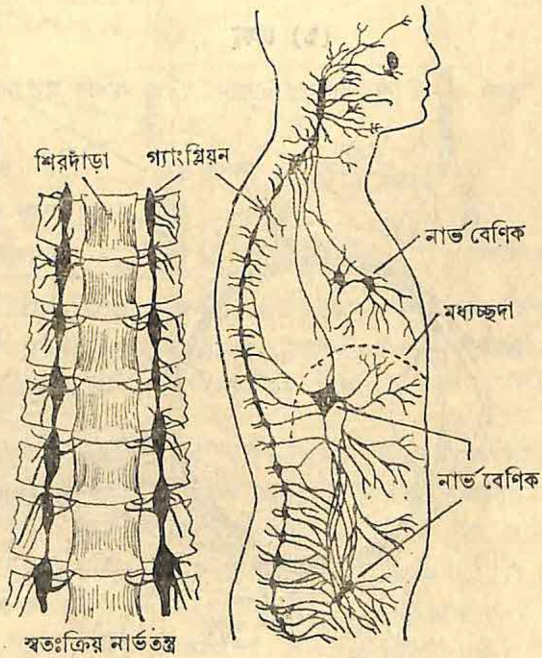
দেহে প্রতিবর্তী ক্রিয়া কেমনভাবে চলে তাহা খুব সহজভাবে দেখান হইল। প্রকৃত পক্ষে কার্যটি এত সহজ নয়। সব প্রতিবর্তী ক্রিয়ায় যে কেবলমাত্র তিনটি নার্ভকোষ জড়িত তাহা নহে। কারণ সংজ্ঞাবহ নিউরন একসঙ্গে অনেকগুলি নার্ভকোষে আবেগকে স্থানান্তরিত করিতে পারে। ঐগুলি হইতে আবেগ অনেকগুলি চালক নিউরনে চলিয়া যাইতে পারে। আঙুলে পিন ফুটিলে আমরা হাত সরাইয়া লই। কিন্তু সেই সঙ্গে হাতে বেদনা অনুভব করি। ইহা হইতে বুঝা যায় আবেগ সুষুম্না কাণ্ড হইতে নার্ভকোষের মধ্য দিয়া মস্তিষ্কে প্রবাহিত হইয়াছে। সুতরাং প্রতিবর্তী ক্রিয়ায় যে কোন সংখ্যায় নার্ভকোষ জড়িত থাকিতে পারে।

সুষুম্না শীর্ষক লালাগ্রন্থি হইতে লালাক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে তাহা আগে বলা হইয়াছে। কিন্তু চোখে খাদ্যবস্তু না দেখিলে লালা বাহির হয় না। ইহার কারণ কি? চোখ নার্ভদ্বারা মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত আছে। খাদ্যের বার্তা মস্তিষ্কে পৌঁছাইলে, মস্তিষ্ক সুষুম্না শীর্ষককে সংবাদ পাঠায়। সুষুম্না শীর্ষক নার্ভ মারফত মুখের লালাগ্রন্থিকে নির্দেশ দেয়। তখন জিভে জল আসে।

সুষুম্না শীর্ষক আমাদের **শ্বাস-প্রশ্বাসের** নিয়ামক। কিন্তু আবেগ না আসিলে ইহা কাজ করিতে পারে না। তোমরা জান ব্যায়ামকালে রক্তে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে দ্রুত শ্বাস চলিতে থাকে। কারণ রক্তে কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধি পাইলে নার্ভের মধ্য দিয়া সেই সংবাদ সুষুম্না শীর্ষকে পৌঁছায়। সুষুম্না শীর্ষক পাঁজরের পেশীগুলিকে দ্রুত সঙ্কোচন প্রসারণের নির্দেশ দেয়। তখন জোরে জোরে শ্বাস চলিতে থাকে।

স্বতঃক্রিয় নার্ভ তন্ত্র

কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র ছাড়া আমাদের দেহে আর একটি নার্ভতন্ত্র আছে।



স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্র

ইহাকে বলা হয় স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্র। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মত এই নার্ভতন্ত্র দেহের ভিতরকার যন্ত্রগুলির কার্য নিয়ন্ত্রণ করে।

স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্র মস্তিষ্ক ও সুষুম্না কাণ্ড হইতে পৃথক হইলেও নার্ভের দ্বারা উহাদের সহিত যুক্ত থাকে। এই নার্ভতন্ত্রকে কিছুদূর অন্তর গাঁট দেওয়া

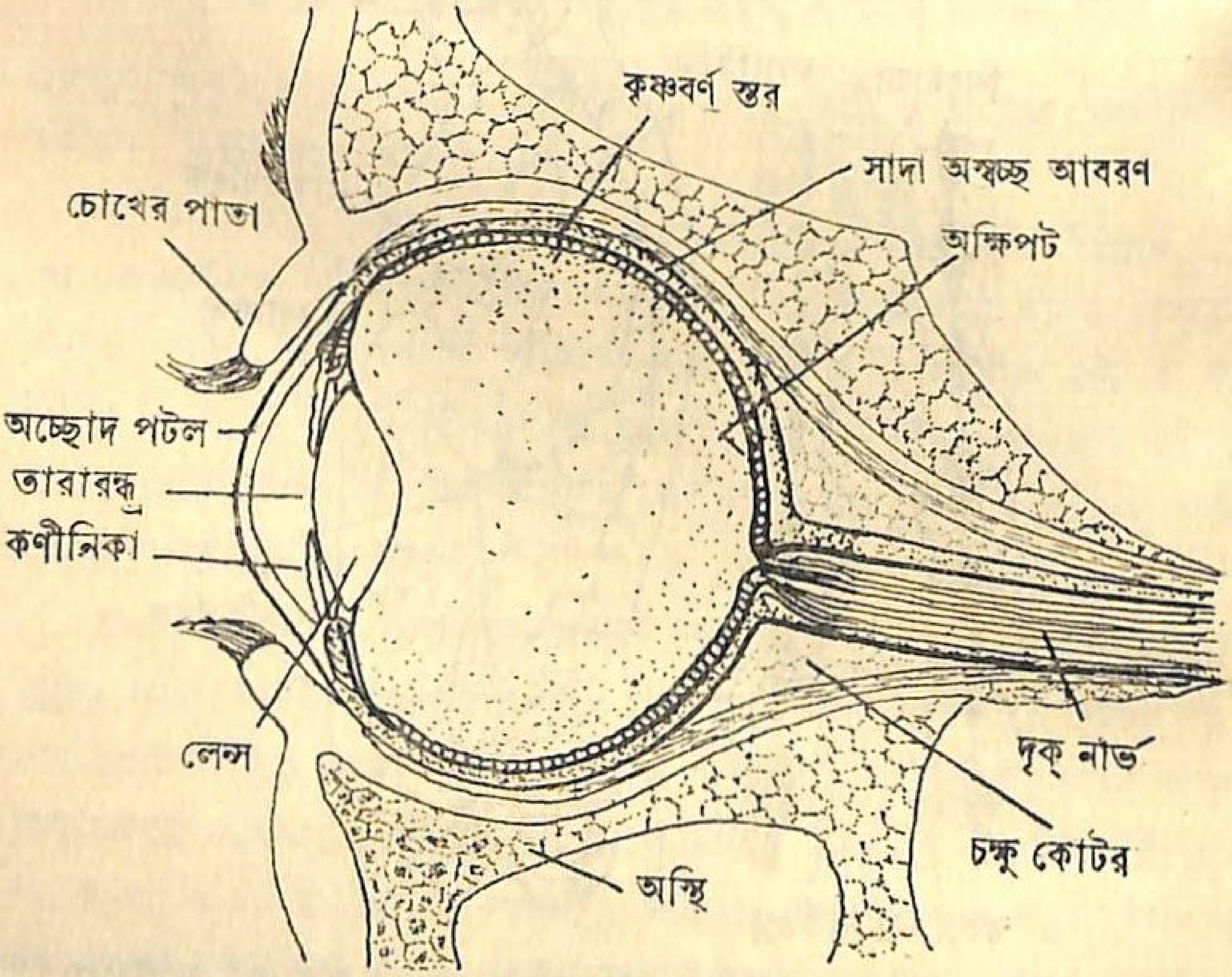
একজোড়া দড়ির সঙ্গে তুলনা করা যায়। দড়ির গাঁটগুলি এক একটি গ্যাংগ্লিয়ন এবং পাশাপাশি দুই গ্যাংগ্লিয়ার মধ্যবর্তী অংশটি নার্ভরজ্জু। নার্ভরজ্জু দুইটি শিরদাঁড়ার দুই পাশে এবং একটু সামনের দিকে থাকে। এই নার্ভতন্ত্র হইতে বহির্গত বড় বড় গ্যাংলিয়ন একসঙ্গে জট বাঁধিয়া দেহের নানা স্থানে নার্ভবেণিক গঠন করে। নার্ভবেণিকগুলি আন্তর দেহযন্ত্রের কাছাকাছি থাকে।

এই বিশেষ নার্ভ তন্ত্র দেহের মধ্যে অবিরাম কাজ করিয়া চলিয়াছে। এই তন্ত্র হৃৎপিণ্ডকে প্রতি মিনিটে ৭০ বার স্পন্দনের নির্দেশ দেয়। ফলে দেহের মধ্যে রক্ত সংবহন অব্যাহত থাকে। ইহা ছাড়া অন্ত্রের ক্রম সংকোচ, অন্তর্গ্রন্থি হইতে ক্ষরণ এবং অন্যান্য আন্তর যন্ত্রগুলির কার্য এই তন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। একতান সঙ্গীতে যেমন প্রতিটি বাদ্যযন্ত্র এক সুরে বাঁধা থাকে, স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্র দেহ যন্ত্রগুলিকে যেন এক সুরে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

সংজ্ঞাবহ ইন্দ্রিয়

(১) চক্ষু

আমাদের চোখ এক ইঞ্চি ব্যাসের একটা ফাঁপা বলের মত। করোটি বা

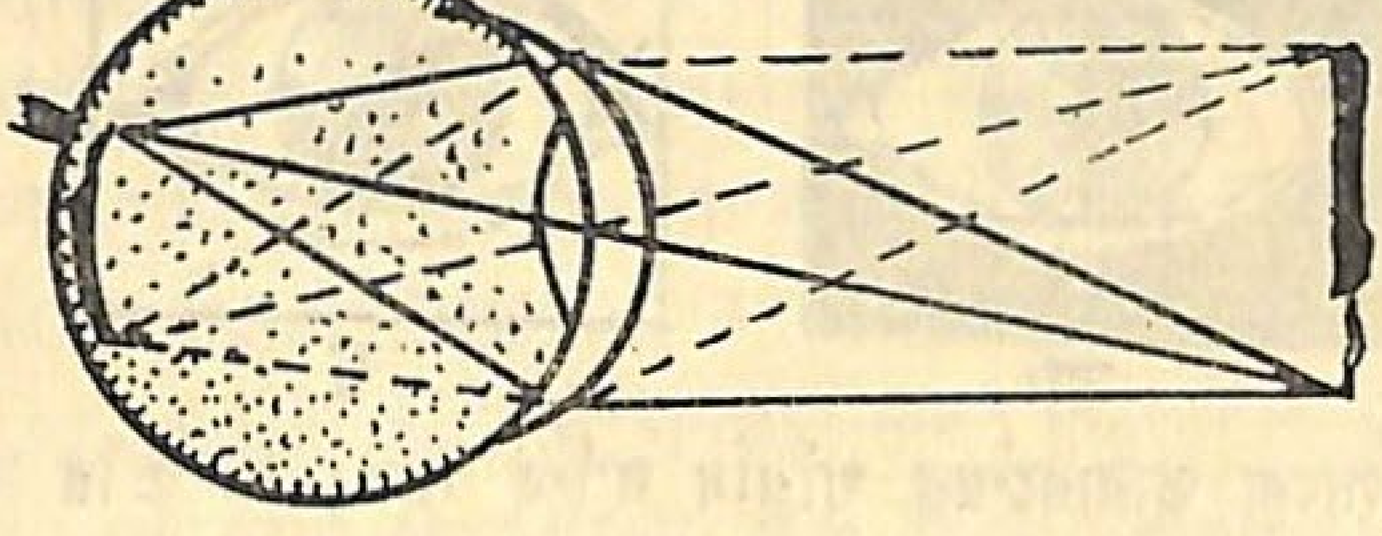


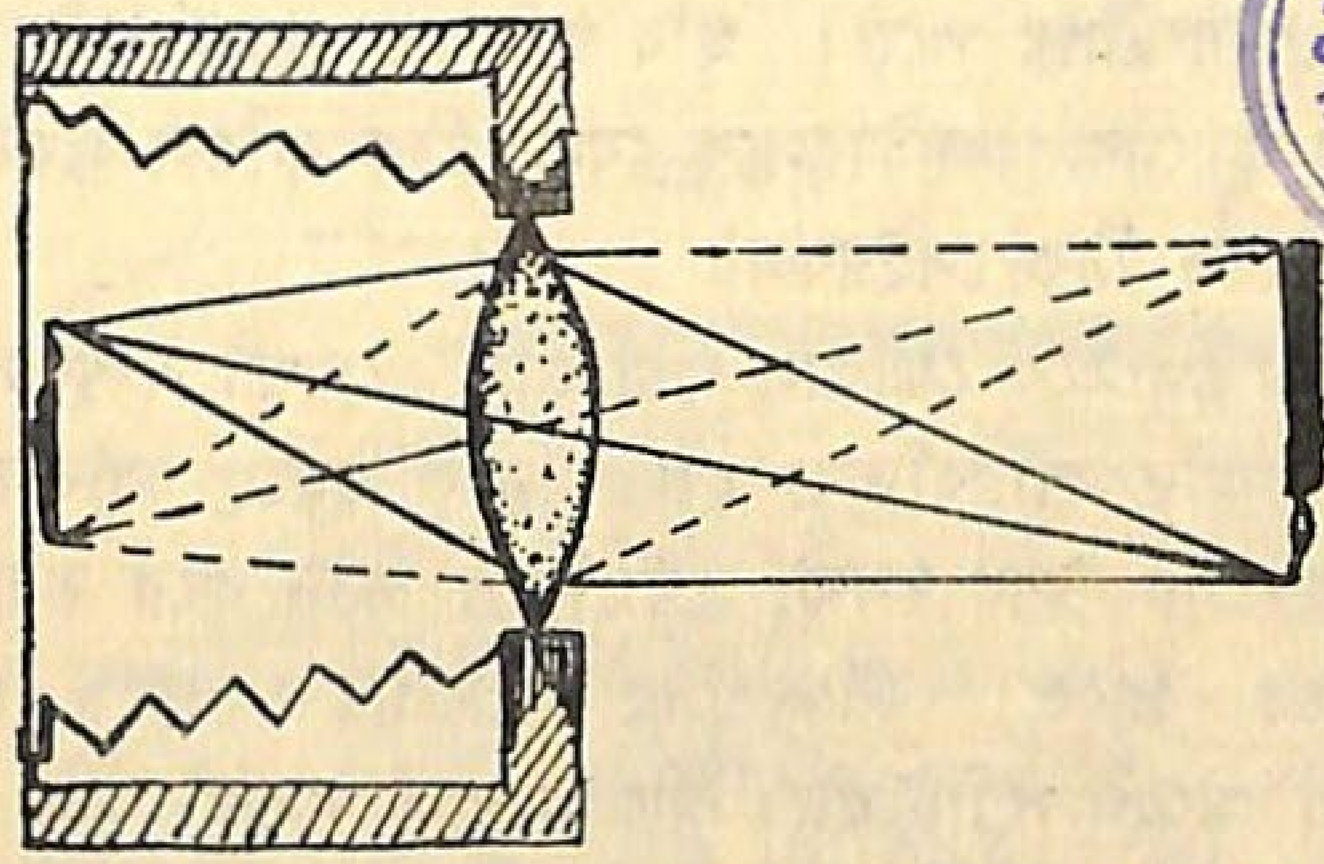
মানুষের চোখ ছোট বলের মত। করোটির চক্ষু কোটরে বসান থাকে।

মাথার খুলির চক্ষু-কোটরে চর্বি দিয়ে তৈরী নরম গদির উপর বলটি বসান থাকে। বলের সঙ্গে যুক্ত ছয়টি পেশী চোখের নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করে। চোখের

সামনে ঝিল্লী ও চামড়া দিয়া গঠিত চোখের পাতা কাজের সময়ে খোলা থাকে, নিদ্রিত অবস্থায় বন্ধ থাকে। অনেক সময়ে চোখের পক্ষে ক্ষতিকর তীব্র আলোর বা ধূলি ঝড়ে চোখের পাতা বন্ধ হইয়া যায়। বলের পিছন দিকে একটি দৃক্ নার্ভ চক্ষুকে মস্তিষ্কের সহিত যুক্ত করে।

বাহিরের আলোক একটি উত্তল, স্বচ্ছ পর্দার মধ্য দিয়া চোখে প্রবেশ করে। ইহাকে আচ্ছাদপটল বলে। চোখের বাকী অংশ একটি সাদা, অস্বচ্ছ আবরণ



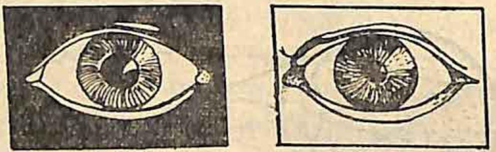


বস্তু হইতে প্রতিফলিত আলোক ক্যামেরার ফিল্মের উপর যেমন উল্টা প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে, আমাদের চোখের অক্ষিপটে ঐভাবে উল্টা প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। মস্তিষ্কে উহা সংশোধিত হয়।

দ্বারা আবৃত থাকে। ইহার মধ্য দিয়া আলো ভিতরে যাইতে পারে না। এই আবরণটির ভিতরে একটি কৃষ্ণবর্ণের স্তর আছে। উহাতে রক্তজালক থাকে। আইরিস বা কনীনিকা, যাহা আচ্ছাদপটল দিয়া দেখা যায়, উহা ঐ কৃষ্ণবর্ণ স্তরের অংশ। কনীনিকা নীল, ধূসর বা কৃষ্ণবর্ণের হয় এবং ইহার কেন্দ্রে, চোখের **লেন্সের** ঠিক সম্মুখে, একটি গোলাকার ছিদ্র বা **তারারন্ধ্র** থাকে। চক্ষু গোলকের ভিতরের স্তরকে বলা হয় **অক্ষিপট**। অক্ষিপট আলোক-সংবেদী কোষ দ্বারা গঠিত এবং কোষগুলির সহিত দৃক্ নার্ভের সংযোগ রহিয়াছে। আচ্ছাদপটল এবং লেন্সের মধ্যবর্তী স্থান জলীয় পদার্থে পূর্ণ, কিন্তু লেন্স হইতে অক্ষিপট পর্যন্ত অংশ জেলির মত স্বচ্ছ পদার্থে পূর্ণ থাকে।

আমরা কিভাবে দেখি—কোন বস্তুর উপর আলোক পড়িলে আমাদের চোখ

বস্তুটিকে দেখিতে পায়। প্রথমে বস্তু হইতে আলোক প্রতিফলিত হইয়া চোখের লেন্সে পড়ে। ছবি তুলিবার সময়ে যেমন বাহিরের আলোক ক্যামেরার লেন্সে পড়ে, সেই রকম। আলোক যদি তীব্র হয় তবে কনীনিকা সঙ্কুচিত হইয়া তারারন্ধ্রকে ছোট করে। ফলে কমমাত্রায় আলো লেন্সের উপর পড়ে। যদি কম পরিমাণ আলো থাকে তবে কনীনিকা প্রসারিত হইয়া তারারন্ধ্র বড় করে। ফলে



ক খ

ক, কম আলোকে তারারন্ধ্রের পরিধি বৃদ্ধি পায়; খ, তীব্র আলোকে তারারন্ধ্র ছোট হইয়া যায়।

বেশী আলো লেন্সের উপর পড়ে। ছবি তুলিবার পূর্বে বাহিরের আলোকের তীব্রতা অনুসারে ক্যামেরার আইরিসকে যেমন ঠিক করিয়া লওয়া হয়, চোখের মধ্যে কনীনিকার কাজ ঠিক সেইরকম।

এইবার চোখের লেন্সকে ফোকাস করা হয়। পেশী সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হইলে লেন্সের আকৃতি পরিবর্তিত হয়। বস্তু হইতে প্রতিফলিত আলোক যতক্ষণ না অক্ষিপটের উপর স্পষ্ট প্রতিবিম্ব গঠন করে ততক্ষণ লেন্সটির আকৃতি বদলাইতে থাকে। অক্ষিপটের আলোক-সংবেদী কোষের উপর প্রতিবিম্ব পড়িলে আবেগ সৃষ্টি হয়। আবেগ দৃক্ নার্ভের মধ্য দিয়া মস্তিষ্কে চলিয়া যায়। আমরা তখন দেখিতে পাই।

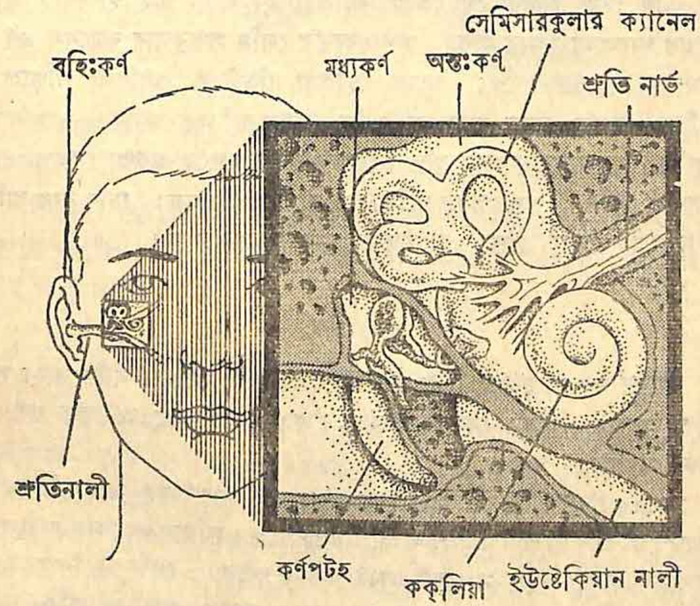
নিকটবর্তী বা দূরবর্তী যে কোন স্থানের বস্তু আমরা চোখ দিয়া স্পষ্ট দেখিতে পাই। ইহার একমাত্র কারণ হইল বস্তু হইতে প্রতিফলিত আলো লেন্সের মধ্য দিয়া অক্ষিপটের উপরে স্পষ্ট প্রতিবিম্ব গঠন করে। বস্তুর দূরত্ব অনুসারে লেন্সটি নিজের আকৃতি পরিবর্তিত করিয়া এই কার্য সম্পন্ন করে। আলো ক্যামেরার লেন্সের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া ফিল্মের উপর যেমন স্পষ্ট প্রতিবিম্ব তৈরী করে, আমাদের অক্ষিপটেও দ্রষ্টব্য বস্তুর একটি স্পষ্ট ছবি তৈরী হয়। কোন কারণে পেশী যদি শিথিল হইয়া পড়ে তবে লেন্স ঠিকমত পরিবর্তিত হইতে পারে না। ফলে অক্ষিপটে ঝাপ্সা প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয়। তখন আমাদের চোখ খারাপ হয়। চোখের সামনে বাড়তি লেন্স বা চশমা ব্যবহার করিয়া অক্ষিপটে স্পষ্ট প্রতিবিম্ব ফেলান হয়।

(২) কর্ণ

আমাদের কানের তিনটি অংশ আছে—**বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ, অন্তঃকর্ণ।**

মাথার পাশে কান দুইটি বহিঃকর্ণ। বহিঃকর্ণ তরুণাস্থি দ্বারা গঠিত এবং অনেকটা ফানেলের মত। ইহা বাহিরের শব্দকে **শ্রুতি নালীর** মধ্যে পাঠাইয়া দেয়। শ্রুতি নালী প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা এবং মাথার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। শ্রুতি নালীর শেষে আছে কানের পর্দা বা **কর্ণপটহ**। শব্দতরঙ্গ কর্ণপটহে ঘা দিলে উহা কম্পিত হয় এবং কর্ণপটহের কম্পন মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণে প্রবাহিত হয়।

মাথার খুলির একটি ছোট গর্তের মধ্যে থাকে মধ্যকর্ণ। এই গর্ত বা মধ্যকর্ণ থাকে ঠিক কর্ণপটহের পিছনে। মধ্যকর্ণে তিনটি ক্ষুদ্র অস্থি আছে। এই অস্থিগুলি পর পর যুক্ত থাকে। একসঙ্গে যুক্ত হাড়ের একপ্রান্ত আটকান থাকে কর্ণপটহের পিছন দিকে এবং অপর প্রান্ত আটকান থাকে অন্তঃকর্ণের পাতলা পর্দায়। একটি সরু ইউস্টেকিয়ান নালী মধ্যকর্ণ ও মুখ-গহ্বরের মধ্যে বিস্তৃত থাকে। এই নালী দিয়া বাতাস মুখ হইতে মধ্যকর্ণে প্রবেশ করে। ফলে



মানুষের শ্রবণেন্দ্রিয়

কর্ণপটহের উভয় পার্শ্বে বাতাসের চাপ সমান থাকে। যদি ভিতর অপেক্ষা বাহিরের বায়ুর চাপ বেশী হয় তবে খুব জোরে শব্দ হইলে কাণের পর্দা ফাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। দ্বিতীয়তঃ এই ব্যবস্থা না থাকিলে শব্দ ঠিকমত শুনা যাইবে না। সর্দি হইলে অনেক সময়ে কাণে তালা লাগে। ইহার কারণ কি? ঐ সময়ে ইউস্টেকিয়ান নালী ফুলিয়া বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। মধ্যকর্ণে

বাতাস যাইতে পারে না। ফলে ঠিকমত শব্দ শুনা যায় না। ঢোঁক গিলিলে বা হাই তুলিলে নালীটি খুলিয়া যায়।

অন্তঃকর্ণে খুলির কর্ণকোটরে অবস্থিত। অন্তঃকর্ণ তিনটি অর্ধবৃত্তাকার নালী বা **সেমি সারকুলার ক্যানেল** এবং শামুকের খোলকের মত পাকান একটি নালী বা **কক্লিয়া** দ্বারা গঠিত। মধ্যকর্ণের অস্থিগুলি কর্ণপটহকে কক্লিয়ার গাত্রের সহিত যুক্ত করে। অন্তঃকর্ণের নালীগুলি জলীয় পদার্থে পূর্ণ থাকে। **আমরা কিভাবে শুনি**—শব্দতরঙ্গ বহিঃকর্ণ দিয়া শ্রুতি নালীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং কর্ণপটহে ধাক্কা দেয়। তখন কর্ণপটহ কাঁপিতে থাকে। কর্ণপটহের কম্পন মধ্যকর্ণের ক্ষুদ্র অস্থিগুলি বাহিয়া কক্লিয়ার গাত্রে চলিয়া আসে এবং কক্লিয়ার জলীয় পদার্থে **কম্পন বা ঢেউ** সৃষ্টি করে। ঢেউগুলি কক্লিয়ার অন্তর্গত শব্দ-সংবেদী কোষগুলিকে উত্তেজিত করে। শব্দ-সংবেদী কোষের আবেগ শ্রুতিনার্ভ দিয়া মস্তিষ্কে চলিয়া যায়। তখন আমরা শুনিতে পাই।

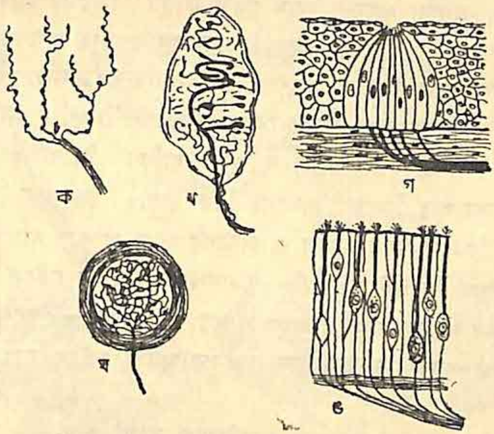
কাণ দিয়া আমরা যে কেবল শুনি তাহা নহে, এই ইন্দ্রিয়টি আমাদের দেহের ভারসাম্য রক্ষার যন্ত্র। অন্তঃকর্ণের সেমি সারকুলার ক্যানেল এই কার্যে আমাদের সহায়তা করে। আমরা হেলিয়া দাঁড়াইলে, ঝুঁকিয়া পড়িলে, পাশ ফিরিলে অর্থাৎ কোন অবস্থায় আছি তাহা বুঝিতে পারি। অর্ধবৃত্তাকার নালীগুলি মুহূর্তের জন্য যদি অকেজো হইয়া পড়ে, আমরা দেহের ভারসাম্য হারাইয়া ফেলি। তখন মাথা ঘুরিতেছে বলিয়া মনে হয়। চোখ বন্ধ রাখিলেও ইহার দ্বারা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা অনুভব করা যায়।

(৩) ত্বক

গায়ের ত্বক বা চামড়া দিয়া আমরা যে অনুভব করিতে পারি তাহা সকলের জানা আছে। স্পর্শ, বেদনা, উত্তাপ, শৈত্য সব কিছু অনুভূত হয় দেহের ত্বকের মাধ্যমে।

হাতের লোমগুলি পেন্সিল দিয়া মৃদুভাবে স্পর্শ কর, সুড়সুড়ি লাগিবে। জোরে পেন্সিল ঘষিলে অল্পক্ষণ পরে যন্ত্রণা বোধ করিবে। কেন এইরূপ হয়? গাত্রচর্মের সর্বত্র স্পর্শ-সংবেদী কোষ ছড়ান থাকে। পেন্সিল দিয়া উত্তেজিত করিলে উহাদের মধ্যে আবেগ সৃষ্টি হয়। আমরা অনুভব করি। এইবার পেন্সিলের পরিবর্তে গরম আলপিন লইয়া হাতের লোমগুলির উপর বুলাইলে স্পর্শ অনুভব করিবে কিন্তু উহাতে উত্তাপ পাইবে না। আলপিনের গা গাত্রচর্মে চাপিয়া ধর, উত্তাপ অনুভব করিবে। এইবার হাতের যে স্থানে গরম আলপিন রাখিয়াছিলে ঐ স্থানে বরফে ঠান্ডা করা আলপিন রাখ। ঠান্ডা ভালভাবে অনুভব করিতে পারিবে না। একটু সরাইয়া আলপিনটি ধর, ঠান্ডা অনুভূত হইবে। ইহা হইতে বুঝা যায়, আমরা ত্বক দিয়া স্পর্শ, বেদনা, উত্তাপ,

শৈত্য সব কিছু অনুভব করি বটে তবে ইহাদের জন্য পৃথক পৃথক সংবেদী কোষ থাকে। সাধারণভাবে ইহারা সকলে একসঙ্গে কার্য করে বলিয়া আমরা কোন্ আলপিন গরম ও সুচালো, কোন্ ছুরি ঠান্ডা ও ভোঁতা, কোন্ জিনিসটি কর্কশ এবং কোন্‌টি মসৃণ তাহা বলিতে পারি।



মানুষের দেহচর্মে অবস্থিত বিভিন্ন রকমের প্রান্তাংগ; ক, বেদনা সংবেদী; খ, স্পর্শ সংবেদী; গ, টেস্ট বাড; ঘ, শৈত্য সংবেদী; ঙ, ঘ্রাণ।

সংবেদী কোষগুলিকে নার্ভতন্ত্রের **প্রান্তাংগ** বলা হয়। দেহচর্মের সর্বত্র প্রান্তাংগগুলি অবস্থান করে। সংজ্ঞাবহ নিউরনের ডেনড্রাইট ইহাদের সহিত যুক্ত থাকে।

(৪) ঘ্রাণ ও স্বাদ

আমরা যে নাক দিয়া ঘ্রাণ লই এবং জিভ দিয়া স্বাদ গ্রহণ করি এই দুই অনুভূতি পৃথক মনে হইলেও একটির সহিত অপরটির যথেষ্ট সম্পর্ক আছে। যদি নাক টিপিয়া পিঁয়াজ খাও তবে পিঁয়াজের আসল স্বাদ পাইবে কি? সর্দি হইলে যখন শ্লেষ্মায় নাক বন্ধ থাকে তখন খাদ্যের পুরাপুরি স্বাদ গ্রহণ করা যায় না। চা, কফি বা অন্যান্য সুগন্ধিযুক্ত খাদ্য খাইবার সময়ে জিভ ও নাক একসঙ্গে কার্য করে। ঘ্রাণ ও স্বাদকে বলা হয় "রাসায়নিক অনুভূতি" কারণ যে বস্তুর ঘ্রাণ বা স্বাদ গ্রহণ করা হয় তাহার সহিত এই দুই জ্ঞানেন্দ্রিয়ের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে আমাদের অনুভূতি জাগে।

সুগন্ধ তাহা খাদ্যদ্রব্যের হউক অথবা কোন সুগন্ধ দ্রব্যের হউক অথবা কোন দুর্গন্ধ আমরা নাক দিয়া অনুভব করি। যখন কোন উৎস হইতে দুর্গন্ধ বা সুগন্ধ বাহির হয়, আসলে উহা হইতে সূক্ষ্ম কণা বাষ্পীভূত হইয়া বাতাসে বা জলে ভাসিয়া বেড়ায়। প্রশ্বাসের সঙ্গে সূক্ষ্ম কণাগুলি নাকে প্রবেশ করে।

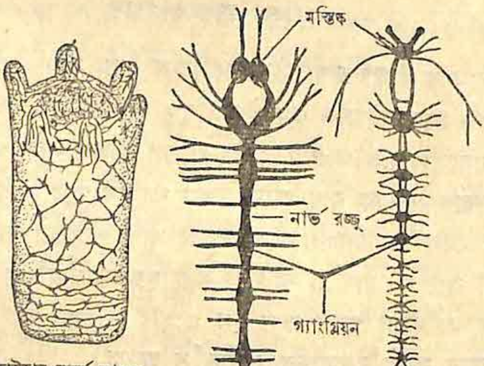
নাসারন্ধ্রের উপর দিকে ঘ্রাণ-সংবেদী কোষগুলির সহিত কণাগুলির রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে আমরা গন্ধের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে পারি। সর্দি হইলে শ্লেষ্মায় নাক যখন বন্ধ থাকে তখন ঘ্রাণ লওয়া যায় না। সেই সময়ে সুগন্ধিযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করিলে খাদ্যের স্বাদ পুরাপুরিভাবে পাওয়া যায় না।

জিভ দিয়া আমরা খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করি। জিভের উপরিভাগে অসংখ্য সূক্ষ্ম কূপ আছে। কূপের নীচে ডিম্বাকারে সাজান সংবেদী কোষ আছে। কূপ এবং ডিম্বাকারে সাজান সংবেদী কোষসমষ্টিকে একত্রে "টেস্ট বাড" বলা হয়। সংবেদী কোষগুলির দ্বারা কোন খাদ্যবস্তু মিষ্ট, কোনটি টক, কোনটি নোন্তা এবং কোনটি তিক্ত তাহা বুঝিতে পারি। মিষ্টি এবং নোন্তা খুব তাড়াতাড়ি বোঝা যায় জিভের সামনের দিক দিয়া। জিভের পিছন দিক দিয়া তিক্ত স্বাদ ও কিনারা দিয়া অম্ল ও লবণের স্বাদ পাওয়া যায়। তবে শুকনো খাদ্য লালামিশ্রিত না হইলে অর্থাৎ খাদ্যবস্তু ভিজা না হইলে স্বাদ গ্রহণ করা যায় না। কারণ খাদ্যের জলীয় অংশ সূক্ষ্ম কূপগুলিতে প্রবেশ করিয়া সংবেদী কোষগুলির সংস্পর্শে না আসিলে আবেগ সৃষ্টি হইবে না।

অন্যান্য প্রাণীদেহে নার্ভ তন্ত্র

এককোষী প্রাণী অ্যামিবা, প্যারামিসিয়াম চলাফেরা করে, শিকার ধরে, পথরোধ করিলে দিক পরিবর্তন করে। উদ্ভিদ জগতেও বিচলনের ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। কিন্তু ইহাদের কোন নার্ভতন্ত্র নাই। এই ধরণের গমন বা বিচলন সহজাত প্রবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নহে।

আদ্যপ্রাণী ও স্পঞ্জ ছাড়া সকল প্রাণীর দেহে নার্ভতন্ত্র আছে। কোথাও

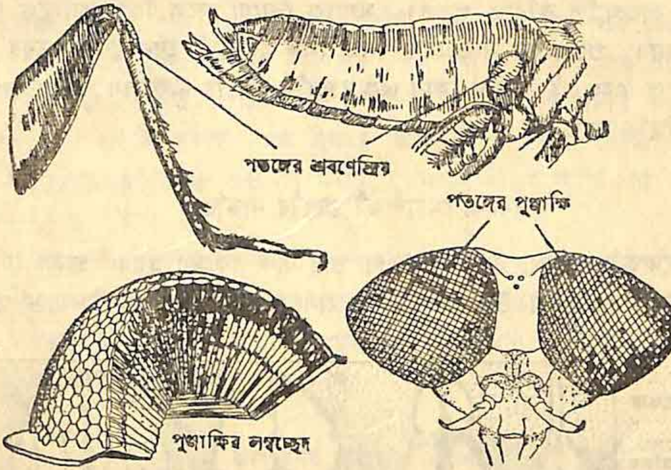


হাইড্রার নার্ভ জালক কেঁচোর নার্ভতন্ত্র চিংড়ির নার্ভতন্ত্র

সরল প্রকৃতির নার্ভতন্ত্র কোথাও বা জটিল। হাইড্রা, জেলিফিস, কেঁচো ও পতঙ্গের নার্ভতন্ত্র সরল প্রকৃতির। মেরুদণ্ডী প্রাণীর নার্ভতন্ত্র বেশ জটিল। নার্ভতন্ত্রের উপর নির্ভর করে কোন একটি প্রাণীর হাবভাব বা চালচলন।

কেঁচো ও সন্ধিপদ প্রাণীর নার্ভতন্ত্র দেখিলে নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীদের নার্ভতন্ত্র কেমন হয় তাহা বুঝা যাইবে।

কেঁচোর নার্ভতন্ত্র—কেঁচোর পেটের দিকে দেহের মাঝ বরাবর একটি লম্বা নার্ভরজ্জু আছে। নার্ভরজ্জুটি মাথার দিকে একটি ছোট মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত। নার্ভরজ্জু এবং মস্তিষ্ক গ্যাংগ্লিয়ন ও নার্ভ দ্বারা গঠিত। গ্যাংগ্লিয়া



হইতে নার্ভ বাহির হইয়া দেহচর্ম, পেশী ও অন্যান্য অংশে প্রবেশ করে। দেহচর্মে এমন অনেক কোষ আছে যেগুলি আলো, বাতাস, জল ও কঠিন বস্তু অনুভব করিতে পারে। খুব সরল প্রকৃতির নার্ভতন্ত্র হইলেও ইহার দ্বারা প্রাণীটি বাহিরের উদ্দীপক গ্রহণ করিয়া আবেগকে মস্তিষ্কে পাঠাইয়া দেয় এবং উদ্দীপকের প্রকৃতি অনুযায়ী প্রাণীটি কার্য করে।

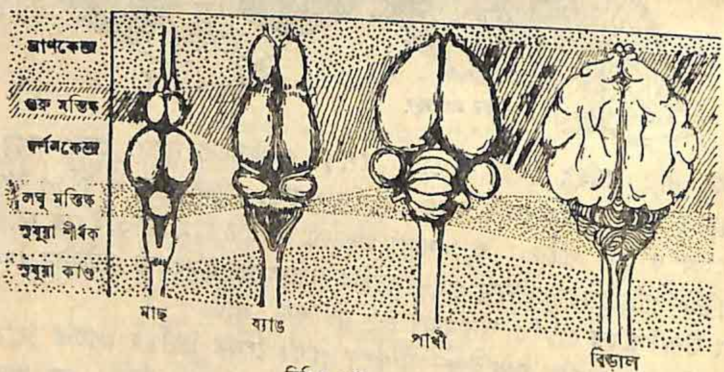
সন্ধিপদ প্রাণীর নার্ভতন্ত্র—সন্ধিপদ প্রাণী যেমন চিংড়ির পেটের দিকে একটি নার্ভরজ্জু দেহের মাঝ বরাবর লম্বালম্বিভাবে বিস্তৃত থাকে। নার্ভরজ্জু মাথার দিকে একটি ছোট মস্তিষ্কের সহিত যুক্ত থাকে। সন্ধিপদ প্রাণীর নার্ভতন্ত্র হুবহু কেঁচোর নার্ভতন্ত্রের মত। তবে কেঁচোর মত উহাদের সারা দেহে সংজ্ঞাবহ কোষগুলি ছড়ান থাকে না। সংজ্ঞাবহ কোষগুলি দলবদ্ধ হইয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় গঠন করে। চিংড়ি, ফড়িং, আরশুলার মাথার দুই পাশে পুঞ্জাক্ষি আছে। পুঞ্জাক্ষি অনেকগুলি ছোট ছোট চোখের সমষ্টি। মাথার সামনে শুঁড় দিয়া স্পর্শ, গন্ধ অনুভব করিতে পারে। প্রজাপতি মুখ দিয়া এবং পা দিয়া ফুলের মধুর স্বাদ পরীক্ষা করিতে পারে। পতঙ্গের উদরে বা পায়ের 'হাঁটু'তে থাকে শ্রবণেন্দ্রিয়। চিংড়ির দেহে ভারসাম্য রক্ষার যন্ত্র আছে।

এই সব প্রাণীদের নার্ভতন্ত্রে জটিলতা না থাকিলেও ইহাদের হাবভাব, চালচলন অনেক বেশী জটিল। যেমন মৌমাছি মৌচাক তৈরী করে, কোন-

দিকে, কতদূরে মধু আছে তাহা সঠিকভাবে অন্যান্য মৌমাছিদের সংবাদ দিতে পারে। মাকড়সা জাল বোনে শিকার ধরিবার জন্য। শিকারের আকৃতি বড় হইলে জাল কাটিয়া উহাকে ছাড়িয়া দেয়, ছোট হইলে জাল নাড়াইয়া উহাকে আরও শক্ত করিয়া জালে আটকাইয়া লয়। তবে এই কাজগুলি উহাদের একটা সহজাত প্রবৃত্তি। কাজগুলিকে শিখিতে হয় না। জন্মের পর হইতে আপনা আপনি কাজগুলি করিতে থাকে। মশাকে নোংরা জলে ডিম পাড়িতে কেহ শিখায় না। প্রত্যেকের নার্ভতন্ত্রে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য যেন জাতিস্মরের মত বাঁধা থাকে এবং এই কারণে কোন এক শ্রেণীর প্রাণীর চালচলন বংশপরম্পরায় অপরিবর্তিত থাকে।

অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর নার্ভতন্ত্র

মেরুদণ্ডী প্রাণীগুলিতে নার্ভতন্ত্র প্রায় এক রকমের হয়। মানব দেহের নার্ভ তন্ত্রের মত মৎস্য, উভচর, পক্ষী ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর নার্ভ তন্ত্রে



বিভিন্ন প্রাণীর মস্তিষ্ক

ক্রমবিকাশের ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণীর গুরুমস্তিষ্ক ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মস্তিষ্ক ও সুষুম্না কাণ্ড দেখা যায়। তবে ক্রমবিকাশের ফলে মস্তিষ্কের গঠন অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে। ছবিতে মাছ, ব্যাঙ, পাখী ও বিড়ালের মস্তিষ্ক দেখিলে বুঝিতে পারিবে গুরুমস্তিষ্ক কেমন ধাপে ধাপে বড় হইয়াছে। এখন নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছ বিড়াল পায়রার চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান কেন।

২

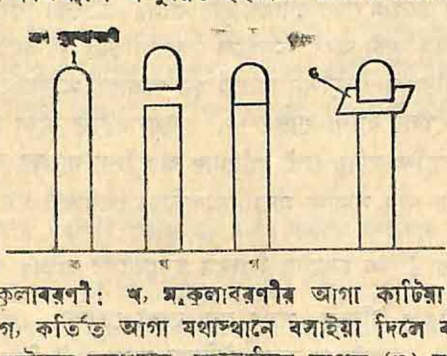
হরমোন

আলুর ক্ষেতে আলুগাছের গোড়ার মাটি সরিয়ে যদি আলুর গায়ে ছুরি দিয়ে সামান্য আঘাত কর, বা খানিকটা কাটিয়া লও, কিছুদিন পর দেখিবে কাটা জায়গায় খোসা তৈরী হইয়া গিয়াছে। এই খোসা আগের মত পাতলা নহে বরং মোটা ছালের মত। কাটা অংশে ছাল তৈরীর কারণ কি জান? আলুর আঘাতপ্রাপ্ত কোষগুলি হইতে **এক প্রকার** রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। পদার্থটির প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের নীচে নূতন কোষস্তর সৃষ্টি হয়। ঐ কোষস্তর ছালে পরিণত হয়।

ক্ষতিগ্রস্ত কোষগুলি হইতে উৎপন্ন রাসায়নিক পদার্থকে বলা হয় **হরমোন।** হরমোন যে কেবল আলুতে বা আঘাতপ্রাপ্ত কোষে উৎপন্ন হয় তাহা নহে। প্রত্যেক উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে ইহা উৎপন্ন হয়। হরমোন জীবদেহের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে এবং দেহকে রোগমুক্ত রাখে।

হরমোন উদ্ভিদের বৃদ্ধির নিয়ামক

হরমোন যে উদ্ভিদের বৃদ্ধির প্রধান কারণ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়। টবে মাটি লইয়া উহাতে কিছু ধান বা ভুট্টা বীজ পুঁতিয়া দাও। জল পাইলে কয়েকদিনের মধ্যে বীজগুলি অঙ্কুরিত হইবে। তোমরা জান ধান বা ভুট্টা বীজ



ক, ভ্রূণ মুকুলাবরণী: খ, মুকুলাবরণীর আগা কাটিয়া দিলে বৃদ্ধি বন্ধ হয়: গ, কর্তিত আগা যথাস্থানে বসাইয়া দিলে বৃদ্ধি ফিরিয়া আসে; ঘ, দুইয়ের মাঝখানে সেলোফিন কাগজ (ঙ) রাখিলে বৃদ্ধি ফিরিয়া আসে না। কেন এইরূপ ঘটে?

অঙ্কুরিত হইলে সর্বপ্রথম ভ্রূণের মুকুলাবরণী মাটি ভেদ করিয়া বাহিরে আসে এবং বড় হইতে থাকে। মুকুলাবরণীর আগা যদি কাটিয়া ফেলা হয় তবে উহার বৃদ্ধি বন্ধ হইবে। কাটা অংশটি যদি পূর্বস্থানে পুনরায় বসাইয়া দেওয়া হয়

তবে উহা আগের মত বাড়িতে থাকিবে। আবার আগাটি একটি সেলোফিন কাগজের টুকরায় বসাইয়া মুকুলাবরণীর কাটা দিকটায় বসাইলে উহা বৃদ্ধি পাইবে না। ইহা হইতে বুঝা যায় মুকুলাবরণীর আগায় এমন একটি পদার্থ উৎপন্ন হয় যাহার উপস্থিতিতে উহার বৃদ্ধি ঘটে। মাথা কাটিয়া ফেলিলে অথবা আগা ও নীচের অংশের মাঝখানে সেলোফিন কাগজ থাকিলে পদার্থটি নীচে যাইতে পারে না। তখন মুকুলাবরণীর বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। কিন্তু আগাটি কাটা মাথায় বসাইয়া দিলে উহা পুনরায় বাড়িতে থাকে। কেন এরূপ হয়? যে হরমোন গাছের বৃদ্ধি ঘটায় উহা কাণ্ডের আগায় উৎপন্ন হইয়া ব্যাপন দ্বারা কোষের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া কাণ্ডের নীচের দিকে চলিয়া আসে। হরমোনের উপস্থিতিতে কাণ্ডের কোষগুলি আয়তনে বাড়িতে থাকে। তখন কাণ্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ঘটে। উদ্ভিদের দেহবৃদ্ধিকারী হরমোনকে বলা হয় অক্সিন। পত্রমুকুল, কচি পাতা, মঞ্জরী-দণ্ড, পুষ্পবৃন্ত ও মূলের আগা—এই স্থানগুলি উদ্ভিদদেহের অক্সিন উৎপাদন কেন্দ্র।

মূল ও কাণ্ডের বৃদ্ধি নির্ভর করে অক্সিনের ঘনত্বের উপর

ভুট্টা গাছের মূলের আগায় অক্সিন উৎপন্ন হয়। ইহা ব্যাপন দ্বারা উপরের কোষগুলিতে চলিয়া আসে। কোষগুলি আয়তনে বৃদ্ধি পায় এবং মূল দৈর্ঘ্যে বড় হয়। যদি মূলের আগা কাটিয়া ফেলা হয় তবে মূলের বৃদ্ধির হার কিছু বেশী হইবে। আগাটি পূর্বস্থানে বসাইয়া দিলে বৃদ্ধির হার কমিয়া যায় অর্থাৎ স্বাভাবিক হয়। মূলের কাটা অংশে যদি মুকুলাবরণীর কর্তিত আগা বসাইয়া দেওয়া হয় তবে মূলের বৃদ্ধির হার কমিয়া যাইবে। কিন্তু মুকুলাবরণীর আগায় মূকুলাবরণীর কাটা অংশ বসাইলে উহা বাড়িতে থাকিবে। মুকুলাবরণীর আগা হইতে যে পরিমাণ অক্সিন বাহির হয় তাহাতে মুকুলাবরণীর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে কিন্তু মূলের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। ইহা হইতে বুঝা যায়, যে পরিমাণ অক্সিন কাণ্ডের বৃদ্ধি ঘটায় সেই পরিমাণ অক্সিন মূলের বৃদ্ধি বন্ধ করে। মূলের বৃদ্ধির জন্য খুব সামান্য মাত্রায় অক্সিন প্রয়োজন হয়।

উদ্ভিদের ট্রপিক চলনের পিছনে হরমোনের প্রভাব আছে

উদ্দীপক আসিলে উদ্ভিদ সাড়া দেয় তাহা তোমরা দেখিয়াছ। ট্রপিক চলনে যে দিক হইতে উদ্দীপক আসে উদ্ভিদ অংগ সেই দিকে অথবা তাহার বিপরীত দিকে ধাবিত হয়। আলো, অভিকর্ষ ও জলের প্রভাবে উদ্ভিদের মূল ও কাণ্ডের বিচলন ঘটে।

আলো যখন উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে তখন কাণ্ড আলোর দিকে এবং মূল আলোর বিপরীত দিকে বাঁকিয়া যায়। ইহাকে আলোকাবৃত্তি বলা হয়।

হরমোনের প্রভাবে উদ্ভিদ অঙ্গের এইরূপ বিচলন ঘটে। অক্সিনের একটি ভৌত ধর্ম আছে। ইহা সব সময়ে আলোকিত স্থান হইতে দূরে বা অন্ধকারের দিকে চলিয়া যায়। আলোকাবর্তী চলনে আলোক এক দিক হইতে আসিয়া গাছের উপর পড়ে। যে দিকে আলো পড়ে সেই দিক আলোকিত হয় এবং বিপরীত দিক অন্ধকারে বা ছায়ার দিকে থাকে। ফলে গাছের কান্ড ও মূলের আগায় উৎপন্ন অক্সিন আলোর দিক হইতে অন্ধকারে ধাবিত হয়। অর্থাৎ মূল ও কান্ডের যে অংশ অন্ধকারে থাকে তথায় অক্সিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কান্ডের এক ধারে বেশী অক্সিন জমা হওয়ায় ঐ অংশ দ্রুত বৃদ্ধি-লাভ করে এবং আলোকিত অংশে অক্সিন প্রায় না থাকায় ঐ অংশ সামান্য অথবা কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায় না। ফলে কান্ডটি আলোর দিকে বাঁকিয়া যায়। মূলে ঘটে ইহার বিপরীত। মূলের অন্ধকার অংশে অক্সিনের পরিমাণ বেশী হওয়া সত্ত্বেও উহা আলোর দিকে বাঁকে না। ইহার কারণ নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছ। আমরা জানি যে পরিমাণ অক্সিন কান্ডের বৃদ্ধি ঘটায় সেই পরিমাণ অক্সিন মূলের বৃদ্ধি স্তব্ধ করে। মূলের অন্ধকার অংশে অক্সিন বেশী থাকায় ঐ অঞ্চল কম বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আলোকিত অংশে অক্সিনের পরিমাণ কম থাকায় ঐ অঞ্চলে বৃদ্ধির হার অনেক বেশী, তাই মূলটি অন্ধকারের দিকে বাঁকিয়া যায়।

উদ্ভিদের অভিকর্ষবর্তী ও জলাবর্তী চলনকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। অভিকর্ষবর্তী চলনে মূল অভিকর্ষের দিকে এবং কান্ড অভিকর্ষের বিপরীত দিকে বৃদ্ধি পায়। গাছকে মাটির উপর অনুভূমিকভাবে রাখিলে অভিকর্ষের প্রভাবে অক্সিন মূল ও কান্ডের নীচের দিকে জমা হয়। কান্ডের নীচের দিকে বেশী অক্সিন জমা হওয়ায় ঐ অংশ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ফলে কান্ডটি বাঁকিয়া উপরে উঠে। মূলের নীচের অংশে বেশী অক্সিন জমা হওয়ায় ঐ অঞ্চল অপেক্ষা উপর দিক দ্রুত বৃদ্ধিলাভ করে। ফলে মূলটি বাঁকিয়া মাটিতে প্রবেশ করে।

প্রাণীদেহে বিশেষ কোষ বা গ্রন্থি হইতে হরমোন উৎপন্ন হয়

স্পঞ্জ, হাইড্রা, সি-অ্যানিমোন প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদেহে বিশেষ বিশেষ কোষ হইতে হরমোন উৎপন্ন হয়। হরমোন সারা দেহে বিস্তার লাভ করিয়া অন্যান্য কোষগুলির কার্যকারিতার উপর প্রভাব বিস্তার করে।

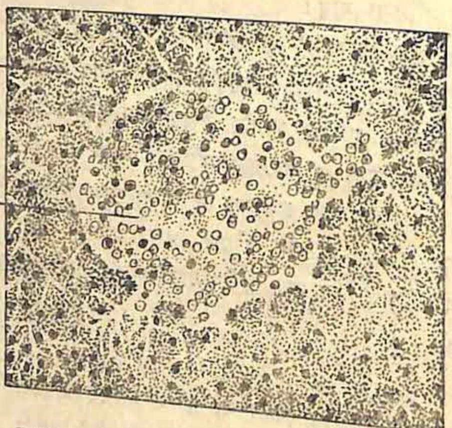
কৃমি জাতীয় প্রাণী হইতে মানুষ পর্যন্ত সকলের দেহে বিশেষ বিশেষ গ্রন্থি হইতে হরমোন নিঃসৃত হয়। গ্রন্থি হইল এমন কতকগুলি কোষের সমষ্টি যেগুলি হইতে কোন বিশেষ ধরণের পদার্থ ক্ষরিত হয়। যেমন, আমাদের গাত্রচর্মে যে ঘর্মগ্রন্থি আছে উহা হইতে ঘাম বাহির হয়। চোখের জল চোখের

পাতার উপরের গ্রন্থি হইতে নির্গত হয়। অগ্ন্যাশয় হইতে নিঃসৃত পাক-রসের এনজাইম শর্করা, প্রোটীন ও স্নেহ দ্রব্যের পাচন ঘটায়। মাকড়সা গ্রন্থি হইতে উৎপন্ন জলীয় পদার্থ দিয়া জাল বোনে। শামুক দেহচর্মের গ্রন্থির সাহায্যে নিজ দেহের চারিদিকে কঠিন খোলকের আবরণ সৃষ্টি করে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের **গ্রন্থি হইতে যে** কত রকমের পদার্থ সৃষ্টি হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহাদের মধ্যে গ্রন্থি হইতে উৎপন্ন এনজাইম ও হরমোন সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু। প্রথমটি খাদ্যের পাচন ঘটায় এবং দ্বিতীয়টি কোষ বিভাজন, কোষের বৃদ্ধি, দেহের আকৃতি ও বিপাকীয় কার্যগুলি নিয়ন্ত্রণ করে।

মানুষের দেহে গ্রন্থি প্রধানতঃ দুই প্রকার

মানুষের দেহের গ্রন্থিগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির গঠন ভালভাবে বুঝিতে পারিলে আমাদের দেহের দুই প্রকার গ্রন্থি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মাইবে। অগ্ন্যাশয় পৌষ্টিকনালীর সহিত জড়িত একটি পরিপাক গ্রন্থি। ইহা হইতে নিঃসৃত অগ্ন্যাশয়-রস একটি নালিকা বাহিয়া ক্ষুদ্রান্ত্রে



ক, অগ্ন্যাশয় কলা; খ, ইনসুলিন উৎপাদনকারী অনাল গ্রন্থি। অগ্ন্যাশয়ে এইরূপ অনেক অনাল গ্রন্থি ছড়ান থাকে। প্রত্যেক গ্রন্থি অনেকগুলি কোষের সমষ্টি।

আসে ও খাদ্যের পাচন ঘটায়। অগ্ন্যাশয় কলার মধ্যে মধ্যে এমন কতকগুলি বিশেষ ধরণের কোষ থাকে যেগুলি হইতে এক প্রকার হরমোন বাহির হয়। ইহার নাম ইনসুলিন। ইনসুলিন উদ্বৃত্ত চিনি যকৃতে জমা রাখিতে এবং প্রয়োজনে ঠিকভাবে কাজে লাগাইতে সাহায্য করে। ইনসুলিন উৎপাদিত

হইবার সঙ্গে সঙ্গে অগ্ন্যাশয়ের রক্তজালকের রক্তে মিশিয়া যায়। কোন নালিকা ব্যবস্থার মাধ্যমে ইহা রক্তে পোঁছায় না।

আমাদের দেহের গ্রন্থিগুলিকে অগ্ন্যাশয়ের পাক-রস উৎপাদনকারী অংশ ও ইনসুলিন উৎপাদনকারী অংশের সহিত তুলনা করিয়া উহাদের দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যকৃত, বৃক্ক, লালাগ্রন্থি, ঘর্মগ্রন্থি প্রভৃতি গ্রন্থিগুলি অগ্ন্যাশয়ের পাক-রস উৎপাদনকারী অংশের মত। কারণ এই গ্রন্থিগুলি হইতে যাহা উৎপন্ন হয় তাহা একটি নালিকার মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়, অর্থাৎ এই গ্রন্থিগুলি নলীযুক্ত। ইহাদের কোন বিশেষ নামে অভিহিত করা হয় না।

হরমোন উৎপাদনকারী গ্রন্থিগুলিকে বলা হয় এণ্ডোক্রিন গ্রন্থি। এণ্ডোক্রিন গ্রন্থির নলী নাই বলিয়া ইহাদের অনাল গ্রন্থি বলা হয়। অনাল গ্রন্থিগুলি অগ্ন্যাশয়ের ইনসুলিন উৎপাদনকারী কোষ সমষ্টির মত নিঃসৃত হরমোনকে সোজাসুজি রক্তে মিশাইয়া দেয়। ফলে রক্তস্রোতে অল্প সময়ের মধ্যে উহা দেহের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।

আমাদের দেহে অনেকগুলি অনাল গ্রন্থি আছে। ইহাদের কার্যকারিতা আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। অনাল গ্রন্থিগুলি স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্রের দ্বারা পরস্পরের সহিত যুক্ত থাকে। স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্রই উহাদের পরিচালনা করে। ইহারা মস্তিষ্কের দ্বারা পরিচালিত হয় না। গ্রন্থিগুলি সকল সময়ে সক্রিয় থাকে এবং নিজ নিজ কার্য সম্পন্ন করে। পতঙ্গ প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর হাব-ভাব, চাল-চলন নির্ভর করে তার নার্ভতন্ত্রের গঠনের উপর। মানুষের ক্ষেত্রে তার স্বভাব, চালচলন কেবল নার্ভতন্ত্রের উপর নির্ভর করে না। মানুষের স্বভাব, চালচলন, দৈহিক ও মানসিক গঠন নির্ধারিত হয় উহার নার্ভতন্ত্র এবং অনাল গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত হরমোনগুলির দ্বারা।

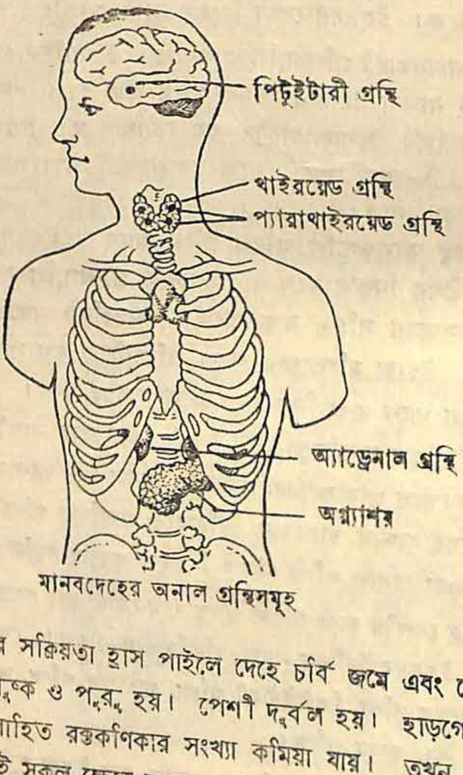
মানুষের দেহে বেশীর ভাগ অনাল গ্রন্থি খুব ছোট এবং দেহের নানা স্থানে অবস্থান করে। ইহাদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যেমন, **থাইরয়েড গ্রন্থি**, **প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি**, **পিটুইটারী গ্রন্থি**, **থাইমাস গ্রন্থি**, **অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি**, **অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি** এবং **জনন গ্রন্থি**।

থাইরয়েড গ্রন্থি : গলায় শ্বাসনালির সম্মুখে এবং ইহার দুই পাশে কালচে লাল রঙের একজোড়া পিণ্ডকে থাইরয়েড গ্রন্থি বলা হয়। ইহা হইতে উৎপন্ন হরমোনকে বলা হয় **থাইরক্সিন**। থাইরক্সিনে বেশী পরিমাণে আইওডিন থাকে। সুতরাং খাদ্যে পরিমিত মাত্রায় আইওডিন না থাকিলে থাইরক্সিন উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটিবে। গ্রন্থি ফুলিয়া গলগণ্ড রোগ দেখা দিবে।

থাইরয়েড আমাদের কি উপকার করে তাহা এমনিতে বুঝা যায় না। কিন্তু জন্মকাল হইতে শিশুর থাইরয়েড গ্রন্থিতে যদি কোন ত্রুটি থাকে তবে উহার দেহ ও মন স্বাভাবিকভাবে গড়িয়া উঠে না। হাত-পায়ের সাধারণ আকৃতি

থাকে না, মাথা ও পেট অত্যধিক বৃদ্ধি পায় এবং শিশু নির্বোধ প্রকৃতির হয়।

থাইরয়েড গ্রন্থির সক্রিয়তা বৃদ্ধি পাইলে অথবা হ্রাস পাইলে দেহের ক্ষতি হয়। ইহার সক্রিয়তা বৃদ্ধি পাইলে বেশী পরিমাণে থাইরক্সিন উৎপন্ন হয়। তখন জৈবনিক কার্যগুলি দ্রুত হারে চলিতে থাকে। দেহের উত্তাপ, হৃদঘাত বাড়িয়া যায়। দেহের ওজন কমিয়া যায় এবং নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটে। মেজাজ খিটখিটে হইয়া যায়।



মানবদেহের অনাল গ্রন্থিসমূহ

থাইরয়েডের সক্রিয়তা হ্রাস পাইলে দেহে চর্বি জমে এবং দেহ বেঁটে হয়। গায়ের চামড়া শুষ্ক ও পুরু হয়। পেশী দুর্বল হয়। হাড়গোড় মোটা হইয়া যায়। রক্তে লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা কমিয়া যায়। তখন রক্তাল্পতা রোগ দেখা দেয়। এই সকল ক্ষেত্রে ভেড়া প্রভৃতি অন্যান্য প্রাণীর থাইরক্সিন প্রদান করিলে উপকার পাওয়া যায়।

প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি : থাইরয়েড গ্রন্থির কাছে গমের দানার মত চারটি প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি আছে। শ্বাসনালির প্রতি পার্শ্বে একজোড়া প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি থাকে। এই গ্রন্থিগুলি হইতে নিঃসৃত হরমোন হাড়, দাঁত ও রক্ত গঠনে সহায়তা করে।

পিটুইটারী গ্রন্থি : মস্তিষ্কের নীচের দিকে পিটুইটারী গ্রন্থি অবস্থান করে। ইহার হরমোন দেহের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। এই গ্রন্থির সক্রিয়তা বৃদ্ধি

পাইলে দেহ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। এই ধরণের আসুরিক দেহ কদাচ পথেঘাটে দেখা যায়। এই গ্রন্থির কর্মক্ষমতা যদি হ্রাস পায় তবে হরমোনের অভাবে দেহের বৃদ্ধি বন্ধ হয় এবং দেহ বেঁটে হইয়া যায়।

পিটুইটারী গ্রন্থি দেহের অনাল গ্রন্থিগুলির অধিনায়ক বলা যায়। এই গ্রন্থি হইতে উৎপন্ন হরমোন অন্যান্য গ্রন্থিগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া উহাদের প্রত্যেকের কার্যের সমন্বয় সাধন করে।



দুইটি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মধ্যে কাহার পিটুইটারী গ্রন্থি বেশী সক্রিয় এবং কাহার কম ?

অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি : প্রত্যেক বৃক্কের উপরে একটি অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি অবস্থান করে। এই গ্রন্থি হইতে নির্গত হরমোনকে অ্যাড্রেনালিন বলে। অত্যধিক ভয় পাইলে বা রাগ হইলে, দৌড়ঝাপ, কুস্তি, হাতাহাতি যুদ্ধ বা দৈহিক বল প্রয়োগের সময়ে অতিরিক্ত মাত্রায় অ্যাড্রেনালিন বাহির হইয়া রক্তে মিশ্রিত হয়। রক্তে অ্যাড্রেনালিনের মাত্রা বৃদ্ধি পাইলে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস আরও বেশী সক্রিয় হইয়া উঠে। রক্ত সংবহনের গতি বৃদ্ধি পায় এবং স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে বেশী রক্ত অক্সিজেনযুক্ত হয়। যকৃত মজুত করা শর্করা ছাড়িতে থাকে। শর্করা অক্সিজেনের সহিত জারিত হইলে অধিক শক্তি নির্গত হয়। এক কথায়, উত্তেজিত অবস্থায় দেহে যাহাতে ক্লান্তি না আসে, পেশীগুলি যাহাতে ঠিকভাবে কার্য করিতে পারে সেইজন্য দেহের পেশীকে বেশী পরিমাণে শক্তি সরবরাহ করা হয়।

রক্তে অ্যাড্রেনালিনের মাত্রা বেশী হইলে পাচনক্রিয়া সাময়িকভাবে বন্ধ হয়।

বর্তমানে অ্যাড্রেনালিন ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির হৃৎপিণ্ড দুর্বল হইলে সূচি প্রয়োগ দ্বারা অ্যাড্রেনালিন দেওয়া হয়। ইহাতে হৃৎপিণ্ডের কর্মক্ষমতা ফিরিয়া আসে। হাঁপানী রোগে রোগীর শ্বাস লইতে কষ্ট হয়। অ্যাড্রেনালিন ফুসফুসের প্রসারণ ঘটাইয়া শ্বাসকষ্ট দূর করে। অস্ত্রোপচারকালে অ্যাড্রেনালিন প্রদান করিলে রক্তনালীগুলি সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে এবং অতিরিক্ত রক্তপাত বন্ধ করে।

থাইমাস গ্রন্থি ঃ থাইমাস গ্রন্থি থাইরয়েডের নীচে বক্ষ অঞ্চলে অবস্থান করে। ইহার কার্য কি তাহা সঠিকভাবে বলা যায় না। মনে হয় দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটাইবার জন্য এই গ্রন্থিটি সচেষ্ট থাকে। শৈশবকালে গ্রন্থিটি বেশ বড় থাকে। চৌদ্দ বছর বয়সের পর উহা ক্রমশঃ ছোট হইতে থাকে।

অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি ঃ অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি যে নলীযুক্ত গ্রন্থি ও অনাল গ্রন্থির সংমিশ্রণ তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। নলীযুক্ত গ্রন্থি ক্ষুদ্রান্ত্রে অগ্ন্যাশয়-রস নিক্ষেপ করিয়া খাদ্যের পাচন ঘটায়।

অগ্ন্যাশয় কলার মধ্যে বিশেষ ধরণের কোষ দল বাঁধিয়া বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করে। প্রত্যেক কোষসমষ্টি একটি অনাল গ্রন্থি। এই গ্রন্থিগুলি হইতে ইনসুলিন নামে একটি হরমোন বাহির হয়। ইনসুলিনের উপস্থিতিতে যকৃত রক্তের উদ্বৃত্ত শর্করা নিজের মধ্যে সঞ্চয় করিতে পারে। রক্তে ইনসুলিনের পরিমাণ কম হইলে যকৃত উদ্বৃত্ত শর্করার সবটুকু লইতে পারে না। ফলে রক্তে শর্করা বৃদ্ধি পায় এবং ইহা হইতে ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগ দেখা দেয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রতিদিন পরিমিত মাত্রায় ইনসুলিন উৎপন্ন না হইলে বহুমূত্র রোগ দেখা দিবে। বহুমূত্র রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রতিদিন প্রয়োজনীয় মাত্রায় ইনসুলিন দিলে রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়ে না। রোগমুক্তির জন্য সারা জীবন ধরিয়া ইনসুলিন নিতে হয়।

জনন গ্রন্থি ঃ পুরুষের দেহে জনন গ্রন্থিকে বলা হয় শুক্রাশয় এবং নারী-দেহের জনন গ্রন্থিকে বলা হয় ডিম্বাশয়। শুক্রাশয় এবং ডিম্বাশয় জনন কার্যে অংশ গ্রহণ করে। ইহা ছাড়া শুক্রাশয় এবং ডিম্বাশয় অনাল গ্রন্থি হিসাবেও কাজ করে।

উপরোক্ত গ্রন্থিগুলি হইতে নিঃসৃত হরমোন পুরুষ ও নারীদেহে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তুলে যাহা দেখিয়া সহজে উহাদের পৃথক করা যায়। শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় হইতে হরমোন নিঃসৃত হইতে থাকিলে যৌবন-কাল শুরু হয়। পুরুষের কণ্ঠস্বর ভারী হয়, মুখে গোঁফ দাড়ি বাহির হয়। নারী ও পুরুষের দেহের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়, আকৃতি ও গঠনে প্রভেদ দেখা যায়। দেহের বিভিন্ন স্থানে মেদকলা জমা হয়। মানসিক গঠন পরিবর্তিত হয়। যার ফলে পুরুষ ও নারীর আচরণ, হাবভাব, কর্মপদ্ধতি ভিন্ন রকমের হয়।

কোষ বিভাজন

ব্যাকটিরিয়া কেমন করে সংখ্যায় বাড়ে তা তোমাদের জানা আছে। প্রথমে কোষের মধ্যভাগে খাঁজ সৃষ্টি হয়। ঐ খাঁজ ক্রমশঃ গভীর হইতে থাকে এবং শেষে কোষটি কাটিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক অর্ধাংশ বৃদ্ধি পাইয়া ব্যাকটিরিয়ায় পরিণত হয়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় **কোষ বিভাজন**। অর্থাৎ একটি কোষ বিভক্ত হইয়া দুইটি কোষ সৃষ্টি করে। শেষোক্ত কোষ দুইটি একই পন্থায় বিভাজিত হইয়া চারিটি কোষে পরিণত হয়। এইভাবে একটি কোষ হইতে অসংখ্য কোষ উৎপন্ন হয়। অ্যামিবা, প্যারামিসিয়াম, ঈষ্ট প্রভৃতি এক-কোষী জীবগুলি কোষ বিভাজন পদ্ধতির দ্বারা নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

(১) **মাইটোসিস ঃ** সকল শ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে কোষ বিভাজন হয়। বিভাজনের সময়ে প্রথমে কোষের নিউক্লিয়াসটি দুইটি সমান ভাগে বিভক্ত হয়। ইহার পর কোষের প্রোটোপ্লাজম দুই ভাগে বিভক্ত হয়। ফলে পূর্বেকার কোষটি দুইটি কোষে পরিণত হয়। আপাতদৃষ্টিতে খুব সহজ মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল।

উদ্ভিদ বা প্রাণীকোষের নিউক্লিয়াসে সুতার মত কতকগুলি বিশেষ ধরণের বস্তু বা ক্রোমোজোম থাকে। সাধারণ অবস্থায় মাইক্রসকোপের নীচে এদের স্পষ্টভাবে দেখা যায় না। তবে কোষ বিভাজন সুরু হইলে নিউক্লিয়াসের ভিতর ক্রোমোজোমগুলিকে স্পষ্ট দেখা যায়। কোষ বিভাজনের সময়ে প্রথমে ক্রোমোজোমগুলি দুই দলে বিভক্ত হয়। প্রত্যেকটি দল হইতে একটি নিউক্লিয়াস উৎপন্ন হয়। পরে নিউক্লিয়াস দুইটির মাঝখানে একটি প্রাচীর গঠিত হয়। ফলে প্রোটোপ্লাজম দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। তখন আমরা দুইটি কোষ দেখিতে পাই এবং প্রত্যেক কোষে একটি নিউক্লিয়াস অবস্থান করে। কোষ দুইটি বড় হয় এবং একই পন্থায় পুনরায় বিভাজিত হইতে থাকে।

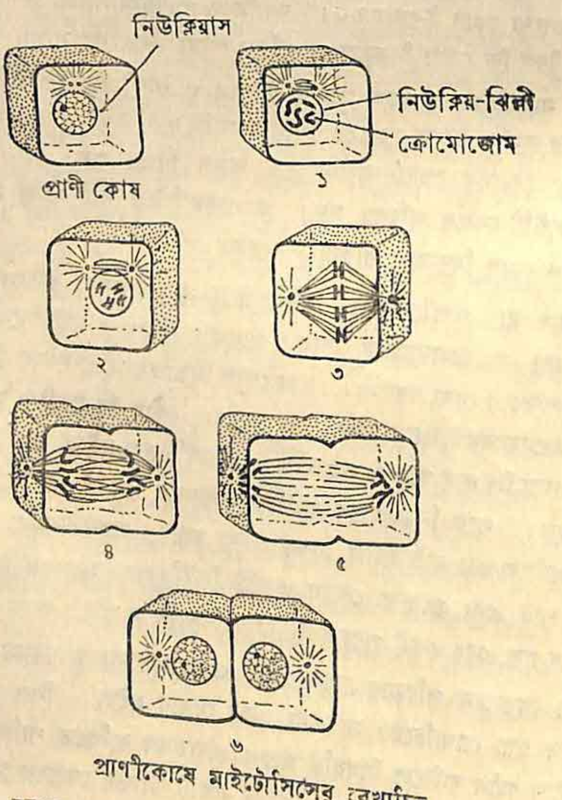
কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় ক্রোমোজোম ও প্রোটোপ্লাজম কেমন ভাবে ধাপে ধাপে ভাগ হয়, রেখাচিত্রের সাহায্যে তাহা দেখান হইল। নিজ হাতে মডেল বা প্রতিরূপ গঠন করিলে বিষয়টি আরও ভালভাবে বুঝিতে পারিবে। একটি দেশলাই এর বাক্স নাও। ধরা যাক এইটি একটি উদ্ভিদ কোষের কোষ-প্রাচীর। রেখাচিত্রের ক্রোমোজোমগুলির মত কাগজ কাটিয়া চারটি কাগজের ক্রোমোজোম তৈরী কর। এইবার কাগজের ফালিগুলিকে একটি সেলোফেন কাগজে রাখিয়া এমনভাবে মুড়িয়া ফেল, যেন মোড়কটি বলের মত দেখায়। কাগজের ক্রোমোজোম

সমেত বলটি নিউক্লিয়াসের প্রতিরূপ। সেলোফেন কাগজের আবরণটি নিউক্লিয়-ঝিল্লী। বলটিকে দেশলাই-এর বাক্সে রাখ। বিভাজনের পূর্বে কোষের অবস্থা ঠিক এইরকম থাকে। এইবার কোষ বিভাজন কিভাবে হয় তা দেখাবার জন্য ধাপে ধাপে নীচে দেওয়া কাজগুলি করিয়া যাও।

১। নিউক্লিয়াস থেকে সেলোফেন কাগজের তৈরী নিউক্লিয়-ঝিল্লী খুলে নাও। অর্থাৎ কোষের মধ্যে কেবল ক্রোমোজোমগুলি পড়িয়া থাকিবে।

২। কাঁচি দিয়া কাগজের ক্রোমোজোমগুলি লম্বালম্বি কাটিয়া ফেল। এখন কোষের মধ্যে আটটি ক্রোমোজোম থাকিবে।

৩। চারটি ক্রোমোজোমকে বাক্সের এক প্রান্তে ও বাকী চারটিকে বাক্সের অন্য প্রান্তে রাখ। অর্থাৎ বাক্সের দুই প্রান্তে দুই দল ক্রোমোজোম থাকিবে।



প্রাণীকোষে মাইটোসিসের রেখাচিত্র

৪। প্রত্যেক দলকে আগের মত সেলোফেন কাগজে মুড়িয়া ফেল। প্রত্যেক মোড়ক হইবে একটি নিউক্লিয়াস। অর্থাৎ এই সময়ে কোষে দুইটি নিউক্লিয়াস দেখিতে পাওয়া যাইবে।

৫। পিচবোর্ড অথবা দেশলাই-এর খোলের খানিকটা অংশ কাটিয়া লইয়া দুইটি নিউক্লিয়াসের মাঝখানে খাড়াভাবে আটকাইয়া দাও। দেখিবে দেশলাই-এর বাক্স দুইটি কোষে পরিণত হইয়াছে।

কোষ বিভাজন বলিতে যা বোঝায় উপরোক্ত মডেলের সাহায্যে তা খুব স্থূলভাবে দেখান যাইতে পারে। এখন দেখা যাক জীবিত কোষের ভিতর কিভাবে এই কার্যগুলি ঘটে।

১। নিউক্লিয়াসের মধ্যে চারটি ক্রোমোজোম স্পষ্ট হইয়া উঠে।

২। প্রত্যেক ক্রোমোজোম লম্বালম্বি চেড়া; অর্ধাংশ দুইটি একটি বিন্দুতে আটকাইয়া থাকে।

৩। নিউক্লিয়-ঝিল্লী গলিয়া অদৃশ্য হয়। ক্রোমোজোমগুলি সারিবন্ধভাবে কোষের মাঝখানে অবস্থান করে।

৪। প্রত্যেক ক্রোমোজোম সম্পূর্ণভাবে চিঁড়িয়া যায় ও অর্ধাংশ দুইটি পৃথক হইয়া পড়ে। ফলে চারটি ক্রোমোজোম হইতে আটটি ক্রোমোজোম উৎপন্ন হয়।

৫। প্রত্যেক ক্রোমোজোমের দুইটি অর্ধাংশের মধ্যে একটি কোষের এক প্রান্তে এবং অন্যটি কোষের অপর প্রান্তে চলিয়া যায়। অর্থাৎ এই সময়ে কোষের দুই প্রান্তে দুই দল ক্রোমোজোম থাকে।

৬। প্রত্যেক দলকে ঘিরিয়া নিউক্লিয়-ঝিল্লী পুনরায় আবির্ভূত হয়। তখন কোষের মধ্যে দুইটি নিউক্লিয়াস দেখা যায়।

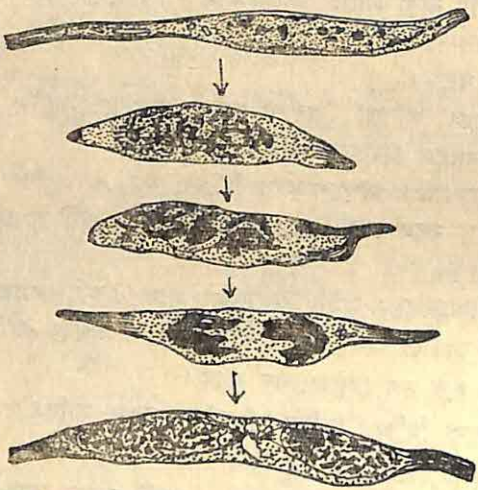
৭। দুইটি নিউক্লিয়াসের মধ্যবর্তী স্থানে একটি নূতন কোষ-প্রাচীর সৃষ্টি হয়। কোষ-প্রাচীর গঠিত হওয়ার সংগে সংগে পূর্বেকার কোষটি দুইটি কোষে পরিণত হয়। পূর্বেকার কোষের মত নূতন কোষ দুইটির নিউক্লিয়াসে চারিটি করিয়া ক্রোমোজোম অবস্থান করে।

উপরোক্ত প্রণালীতে কোষ বিভাজনকে বলা হয় **মাইটোসিস**। মাইটোসিস পদ্ধতিতে নূতন কোষ সৃষ্টির ফলে গাছের মূল ও কাণ্ড দৈর্ঘ্যে বড় হয়। মাইটোসিস বিভাজনের ফলে ডিমের মধ্যে ভ্রূণ বৃদ্ধি পেয়ে মুরগীর বাচ্চায় পরিণত হয়। হাত ও পায়ের আংগুলের নখের মূলে মাইটোসিস পদ্ধতিতে কোষ বিভাজনের ফলে নখ বড় হইতে থাকে।

মাইটোসিসের প্রকারভেদ ঃ মাইটোসিস বিভাজনের সার অংশ তোমাদের সামনে উপস্থাপিত করা হইল। সাধারণভাবে বলিতে গেলে উদ্ভিদ ও প্রাণী-দেহের কোষ এইভাবে বিভক্ত হয়। এই পদ্ধতি আরও সবিস্তারে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ব্যবহার করিয়া আলোচনা করা যায়। উদ্ভিদ ও প্রাণীকোষের বিভাজন মোটামুটি এক রকমের হইলেও ইহাদের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য থাকে। বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীকোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা এক নহে এবং

উহাদের আকৃতির তারতম্য দেখা যায়। তাহা ছাড়া কোন কোন উদ্ভিদকোষে কিছুটা পরিবর্তিত ধরণের মাইটোসিস দেখা যায়। বড় হইয়া এ বিষয়ে সবকিছু জানিতে পারিবে।

ক্রোমোজোম সংখ্যা ঃ যে কোন একটি প্রজাতির উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহে ক্রোমোজোমের সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে। যেমন, পিঁয়াজের ক্রোমোজোম সংখ্যা ১৬। অর্থাৎ পিঁয়াজ গাছের মূল, কান্ড ও পাতার প্রত্যেকটি কোষের নিউ-



মাইক্রসকোপের নীচে পেশীকোষের মাইটোসিস যেমন দেখায়
(৬৫০ গুণ বিবর্ধিত)

ক্লিয়াসে ১৬টি ক্রোমোজোম থাকিবে। পৃথিবীর সর্বত্র পিঁয়াজ গাছগুলিতে এই সংখ্যায় ক্রোমোজোম থাকে। মানুষের ক্রোমোজোম সংখ্যা ৪৬। পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের দেহকোষের নিউক্লিয়াসে ৪৬টি ক্রোমোজোম পাওয়া যায়। শামুক, টমাটো, ফরিঙের দেহকোষে ২৪টি, গমে এবং বিড়ালে ১৬টি, কেঁচোয় ৩২টি এবং বড় ইঁদুরে ৩৮টি ক্রোমোজোম থাকে।

মাইটোসিসের উদ্দেশ্য ঃ মাইটোসিস বিভাজনের সুরুতে নিউক্লিয়াসে যতগুলি ক্রোমোজোম থাকে, বিভাজনের পরে নূতন নিউক্লিয়াস দুইটির প্রত্যেকটিতে ঠিক সেই সংখ্যায় ক্রোমোজোম থাকিবে। এই কারণে মাইটোসিসকে সম-বিভাজন বলা হয়। সম-বিভাজনের ফলে যে কোন উদ্ভিদ বা প্রাণীদেহের প্রত্যেকটি কোষে একই সংখ্যায় ক্রোমোজোম বণ্টন হয়। তাই প্রথম কোষ বা মাতৃকোষের সমস্ত বৈশিষ্ট্য পরবর্তী বা অপত্য কোষগুলিতে সমানভাবে বিদ্যমান থাকে।

(২) মায়োসিস

উচ্চতর উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহ অসংখ্য কোষ দ্বারা গঠিত। এই কোষগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—দেহকোষ এবং জনন কোষ। যে কোষগুলি দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠন করে তাহাদের বলা হয় দেহকোষ। আমাদের দেহের হাত, পা, মাথা, গলা, বুক, পেট দেহকোষ দিয়ে তৈরী। উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড, পাতা গঠিত হয় দেহকোষ দিয়ে। দেহকোষগুলির চেহারা এবং গঠন বিভিন্ন রকমের হয়। জননকোষ দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠন করে না। এই কোষগুলি উদ্ভিদ বা প্রাণীর জনন অংগে অবস্থান করে এবং কেবলমাত্র জননকার্যে অংশ গ্রহণ করে। নূতন উদ্ভিদ বা প্রাণী সৃষ্টি করা এদের একমাত্র কার্য।

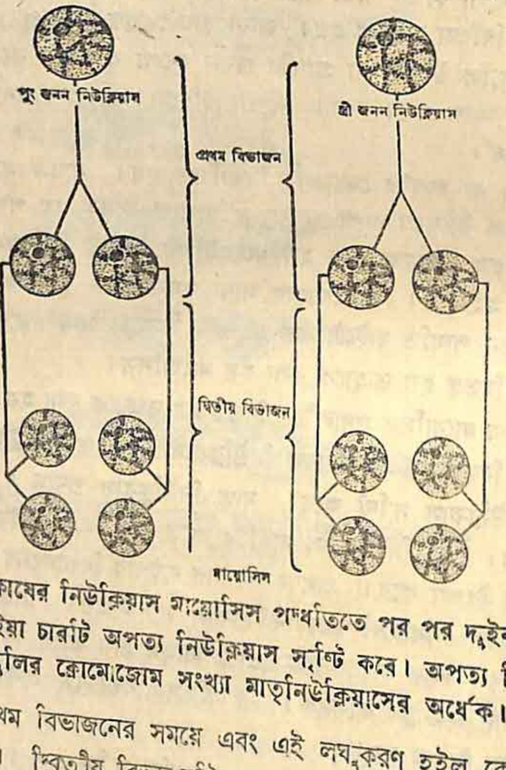
উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহকোষ বিভাজিত হয়। নূতন নূতন কোষ সৃষ্টি হওয়ার ফলে উহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বৃদ্ধিলাভ করে। যে পদ্ধতিতে দেহকোষ বিভাজিত হয় তাহাকে বলা হয় মাইটোসিস। এই বিভাজন পদ্ধতি পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। দেহকোষের ন্যায় জননকোষও বিভাজিত হয়। কিন্তু এই বিভাজন পদ্ধতি মাইটোসিস অপেক্ষা কিছুটা অন্য ধরণের। যে পন্থায় জননকোষ বিভক্ত হয় তাহাকে বলা হয় **মায়োসিস**।

যে কোষ মায়োসিস প্রণালীতে বিভক্ত হয় তাহাকে বলা হয় জনন মাতৃকোষ। মায়োসিস বিভাজনে মাতৃকোষের নিউক্লিয়াসটি পর পর দুইবার বিভক্ত হইয়া চারিটি নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। মাতৃ নিউক্লিয়াস প্রথমে দুইটি নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। এই নিউক্লিয়াস দুইটির প্রত্যেকটি বিভক্ত হইয়া দুইটি অপত্য নিউক্লিয়াস উৎপন্ন করে। অর্থাৎ পর পর দুইবার বিভাজনের ফলে মাতৃ নিউক্লিয়াস হইতে চারিটি অপত্য নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হয়। নিউক্লিয়াস বিভাজন সমাপ্ত হইলে জনন মাতৃকোষের প্রোটোপ্লাজম চার ভাগে বিভক্ত হয়। প্রতি ভাগে একটি নিউক্লিয়াস থাকে। মায়োসিস বিভাজনে একটি কোষ হইতে চারিটি কোষ উৎপন্ন হয়।

মায়োসিস বিভাজনে যে অপত্য কোষগুলি সৃষ্টি হয়, মাতৃকোষের সহিত উহাদের কিছুটা পার্থক্য থাকে। যদি ক্রোমোজোম সংখ্যা গণনা করা হয় তবে দেখা যাইবে অপত্য কোষের নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক। অর্থাৎ মাতৃকোষে যতগুলি ক্রোমোজোম থাকে, তার অর্ধেক ক্রোমোজোম থাকে অপত্য কোষগুলিতে। এই বিভাজনে ক্রোমোজোম সংখ্যা কমিয়া যায় বলিয়া মায়োসিসকে **লঘূকরণ** বিভাজন বলা হয়।

মায়োসিস বিভাজনে জনন মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস পর পর দুইবার বিভাজিত হয় এ কথা আগে বলা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে, প্রথম বিভাজনের পর মাতৃ নিউক্লিয়াস হইতে যে দুইটি নিউক্লিয়াস উৎপন্ন হয় উহাদের মধ্যেই

ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হইয়া যায়। যদি মাতৃ নিউক্লিয়াসে চারিটি ক্রোমোজোম থাকে তবে প্রথম বিভাজনের পর নিউক্লিয়াস দুইটির প্রত্যেকটিতে দুইটি করিয়া ক্রোমোজোম থাকিবে। প্রথম বিভাজনের পরে আসে দ্বিতীয় বিভাজন। প্রত্যেক দুই-ক্রোমোজোমযুক্ত নিউক্লিয়াস বিভক্ত হইয়া যে দুইটি অপত্য নিউক্লিয়াস উৎপন্ন করে উহাদের ক্রোমোজোম সংখ্যা দুই-ই থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে সমগ্র মায়োসিস প্রণালীকে লঘুকরণ বিভাজন বলা হইলেও আসল



জনন মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস মায়োসিস পদ্ধতিতে পর পর দুইবার বিভাজিত হইয়া চারটি অপত্য নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। অপত্য নিউক্লিয়াসগুলির ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃনিউক্লিয়াসের অর্ধেক।

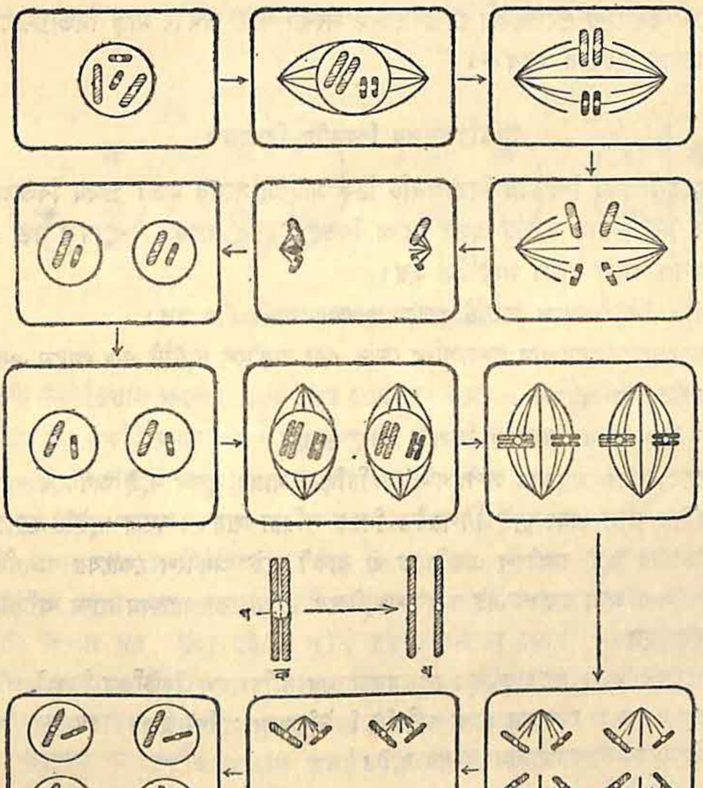
লঘুকরণ ঘটে প্রথম বিভাজনের সময়ে এবং এই লঘুকরণ হইল ক্রোমোজোম সংখ্যার লঘুকরণ। দ্বিতীয় বিভাজনটির কোন জটিলতা নাই। ইহা পুরোপুরি মাইটোসিস বিভাজনের মত।

মায়োসিস বিভাজন ধাপে ধাপে সংঘটিত হয়। যেমন—

নিউক্লিয়াসের প্রথম বিভাজন

১। নিউক্লিয়াসে চারিটি ক্রোমোজোমের আবির্ভাব ঘটে।
২। এক রকম চেহারাযুক্ত ক্রোমোজোমগুলি জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে। নিউক্লিয়-ঝিল্লী কোষের প্রোটোপ্লাজমে অদৃশ্য হয়।

৩। প্রতি জোড়া ক্রোমোজোমের একটি কোষের এক দিকে ও অপরটি বিপরীত দিকে চলিয়া যায়। কোষে দুই জোড়া ক্রোমোজোম আছে। এইভাবে পৃথক হওয়ায় দুইটি ক্রোমোজোম কোষের এক প্রান্তে এবং অপর দুইটি ক্রোমোজোম কোষের অপর প্রান্তে জমায়েত হয়। ফলে কোষের দুই প্রান্তে



মায়োসিসের রেখাচিত্র। ১ম ও ২য় সারি, প্রথম বিভাজনের বিভিন্ন অবস্থা; ৩য় ও ৪র্থ সারি, দ্বিতীয় বিভাজনের বিভিন্ন অবস্থা; ক, ক্রোমোজোমের বিবর্ধিত চিত্র। ক্রোমোজোমের দুই অর্ধাংশ একটি বিন্দু বা সেন্ট্রোমেয়ার (গ) দ্বারা একত্রে যুক্ত। সেন্ট্রোমেয়ার লম্বালম্বি চিড়িয়া গেলে খ চিত্রের ন্যায় দুই অর্ধাংশ পৃথক হইয়া পড়ে।

দুই দল ক্রোমোজোম দেখা যাইবে। প্রত্যেক দলে দুইটি করিয়া ক্রোমোজোম আছে।

৪। প্রত্যেক দলকে ঘিরিয়া নিউক্লিয়-ঝিল্লী পুনরায় আবির্ভূত হয়। তখন

কোষের দুই ধারে দুইটি নিউক্লিয়াস দেখা যায়। প্রথম বিভাজন এইখানে সমাপ্ত হয়।

লক্ষ্য করিয়া দেখ, মাতৃ নিউক্লিয়াস হইতে যে দুইটি নিউক্লিয়াস উৎপন্ন হইয়াছে, উহাদের প্রত্যেকের ক্রোমোজোম সংখ্যা দুই অর্থাৎ মাতৃ নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক।

নিউক্লিয়াসের দ্বিতীয় বিভাজন

মায়োসিসের দ্বিতীয় বিভাজনটি ঠিক মাইটোসিসের মত। প্রথম বিভাজনে উৎপন্ন নিউক্লিয়াস দুইটি একই সঙ্গে বিভক্ত হইতে থাকে। পূর্বের মত এই বিভাজনও ধাপে ধাপে সংঘটিত হয়।

১। প্রতি নিউক্লিয়াসে দুইটি ক্রোমোজোমের আবির্ভাব হয়।

২। প্রত্যেক ক্রোমোজোম লম্বালম্বি চেড়া এবং অর্ধাংশ দুইটি এক স্থানে একত্রে আটকাইয়া থাকে।

৩। নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয়-ঝিল্লী বিলুপ্ত হয়।

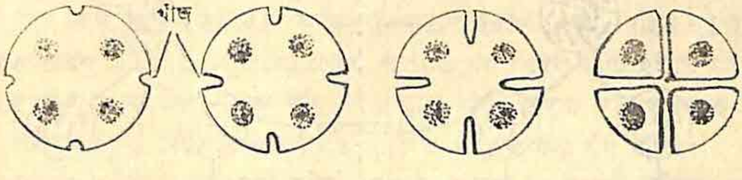
৪। প্রত্যেক ক্রোমোজোম সম্পূর্ণভাবে চিড়িয়া যায়। তখন দুই অর্ধাংশ পৃথক হইয়া পড়ে এবং দুই বিপরীত দিকে সরিয়া যায়। ফলে দুইটি ক্রোমোজোমের দুই অর্ধাংশ একদিকে ও বাকী দুই অর্ধাংশ কোষের অন্যদিকে আসিয়া জমা হয়। এই অর্ধাংশগুলিকে এখন ক্রোমোজোম নামে অভিহিত করা হয়।

৫। পূর্বের ন্যায় প্রত্যেক দল ক্রোমোজোমের চারিপাশে নিউক্লিয়-ঝিল্লী গঠিত হয়। ফলে কোষের মধ্যে চারিটি নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোম সংখ্যা দুই।

প্রোটোপ্লাজমের বিভাজন

নিউক্লিয়াস বিভাজন সমাপ্ত হইলে মাতৃকোষের প্রোটোপ্লাজম চার ভাগে বিভক্ত হয়। মাইটোসিস বিভাজনের শেষে দুই অপত্য নিউক্লিয়াসের মধ্যবর্তী স্থানে একটি কোষ-প্রাচীর গঠিত হয়। ইহাতে মাতৃকোষের প্রোটোপ্লাজম দুই ভাগে বিভক্ত হয়। জননকোষ বিভাজনের শেষে কোন কোষ-প্রাচীর নির্মিত হয় না। এখানে প্রোটোপ্লাজমের বিভাজন ঘটে অন্যভাবে। জননকোষ নগ্ন; ইহার চারিপাশে কোন কোষ-প্রাচীর থাকে না। প্রথমে প্রোটোপ্লাজমের বহিরাংশে খাঁজ দেখা দেয়। এই খাঁজ ক্রমশঃ ভিতর দিকে অগ্রসর হয় এবং পরিশেষে প্রোটোপ্লাজম দুই ভাগে বিভক্ত হয়। বায়ু ভরা বেলুনের মাঝ বরাবর সুতার ফাঁস লাগাইয়া সুতার দুই প্রান্ত ধরিয়া টান দিলে, ফাঁসের চাপে ঐ অঞ্চল যেমন

সরু হইতে থাকে, প্রোটোপ্লাজমের খাঁজ অনেকটা ঐ রকমের। জননকোষ নিউক্লিয়াস বিভাজনের শেষে প্রোটোপ্লাজমে দুইটি খাঁজ দেখা দেয় এবং ইহারা একটি অপরটির সমকোণে থাকে। খাঁজ দুইটি একই সঙ্গে কোষের কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হয়। ফলে প্রোটোপ্লাজম চার ভাগে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক ভাগে



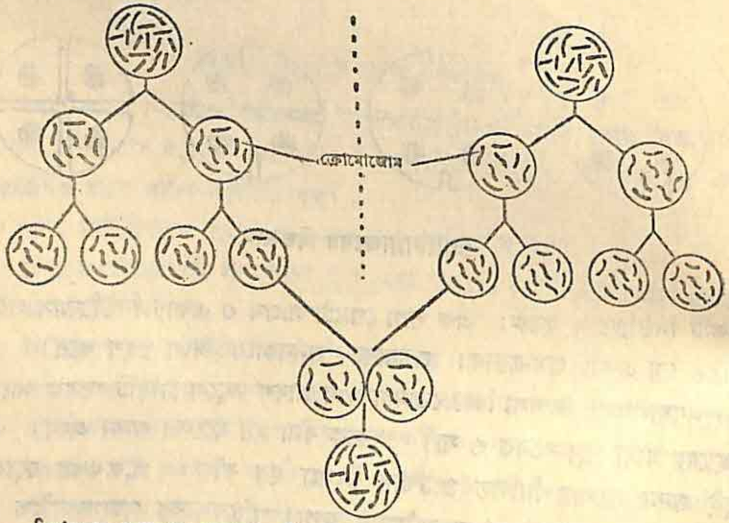
প্রোটোপ্লাজমের বিভাজন

একটি নিউক্লিয়াস থাকে। এক ভাগ প্রোটোপ্লাজম ও একটি নিউক্লিয়াস লইয়া গঠিত হয় একটি **জননকোষ**। জননকোষ জননকার্যে অংশ গ্রহণ করে।

মায়োসিসের উদ্দেশ্য কি? তোমরা জান আদর্শ ফুলে চারিটি স্তবক আছে। ইহাদের মধ্যে পুং স্তবক ও স্ত্রী স্তবককে বলা হয় ফুলের জনন অংগ। এই দুই জনন অংগের মিলিত প্রচেষ্টায় উৎপন্ন হয় বীজ। পুংকেশর ফুলের পুংজনন অঙ্গ এবং গর্ভপত্র স্ত্রীজনন অঙ্গ। পুংকেশরের পরাগধানীতে যে রেণু উৎপন্ন হয় উহা হইতে সৃষ্টি হয় পুংজনন কোষ এবং ডিম্বাশয়ের ডিম্বকের মধ্যে সৃষ্টি হয় স্ত্রীজনন কোষ। একটি পুংজনন কোষ ও একটি স্ত্রীজনন কোষের মিলনে জন্মলাভ করে বীজ—গাছের ভবিষ্যত বংশধর।

উদ্ভিদ বা প্রাণীর প্রত্যেক প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যা নির্দিষ্ট, এ কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। মায়োসিস বিভাজন ক্রোমোজোম সংখ্যা নির্দিষ্ট রাখিতে সাহায্য করে। পিঁয়াজ গাছের কথা ধরা যাক। পিঁয়াজ গাছের ক্রোমোজোম সংখ্যা ১৬। অর্থাৎ গাছের প্রত্যেকটি কোষে ১৬টি ক্রোমোজোম থাকে। পুংজননকোষ ও স্ত্রীজননকোষের প্রত্যেকটিতে ১৬টি ক্রোমোজোম থাকিবে। এই দুই জননকোষের মিলনে যে বীজ উৎপন্ন হইবে, উহার ক্রোমোজোম সংখ্যা হইবে (১৬+১৬=) ৩২। এই বীজ হইতে যে গাছ জন্মাইবে তাহার পুংজনন-কোষ ও স্ত্রীজননকোষের প্রত্যেকটিতে ৩২টি ক্রোমোজোম থাকিবে। ইহাদের মিলনে যে বীজ উৎপন্ন হইবে, উহার ক্রোমোজোম সংখ্যা হইবে (৩২+৩২=) ৬৪। এই ঘটনা চলিতে থাকিলে প্রত্যেক পুরুষে ক্রোমোজোম সংখ্যা পূর্ব সংখ্যার দ্বিগুণ হইবে। তখন কোষের মধ্যে স্থানাভাব দেখা দিবে। তা ছাড়া গাছের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবর্তিত হইতে থাকিবে। সুতরাং প্রত্যেক

পুরুষে ক্রোমোজোম সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি না পায় তার জন্য প্রকৃতিতে একটি সুন্দর কৌশল আছে এবং তা হল মায়োসিস বিভাজন। জননকোষগুলি মিলিত হইবার পূর্বে একবার মায়োসিস প্রণালীতে বিভাজিত হয়। ইহাতে অপত্য কোষগুলির ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হইয়া যায়। পিঁয়াজের পুংজনন মাতৃকোষ বিভাজিত হইয়া যে অপত্য কোষ সৃষ্টি করে, উহার ক্রোমোজোম সংখ্যা হইবে ৮। স্ত্রীজনন মাতৃকোষ বিভাজিত হইলে একই ব্যাপার ঘটিবে। এই-



পিঁয়াজ ফুলের পরাগধানীর রেণু-মাতৃকোষ এবং ডিম্বকের স্ত্রীজনন মাতৃকোষের মায়োসিস বিভাজন। উভয় ক্ষেত্রে মাতৃনিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোম সংখ্যা ১৬। উহা হইতে যে অপত্য নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হয়, তাহাদের ক্রোমোজোম সংখ্যা ৮। পুংজননকোষ ও স্ত্রীজননকোষ মিলিত হইলে পূর্বের ক্রোমোজোম সংখ্যা ফিরিয়া আসে।

বার ৮টি ক্রোমোজোমযুক্ত পুংজননকোষ ৮টি ক্রোমোজোমযুক্ত স্ত্রীজননকোষের সহিত মিলিত হইয়া যে বীজ উৎপাদন করিবে তাহার ক্রোমোজোম সংখ্যা হইবে ১৬। অর্থাৎ আসল ক্রোমোজোম সংখ্যা পুনরায় ফিরিয়া আসে। জননকোষের মিলন দ্বারা যে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী বংশ বৃদ্ধি করে তাহাদের সকলের ক্ষেত্রে এই পন্থায় ক্রোমজোম সংখ্যা নির্দিষ্ট রাখা হয়।

৪
বৃদ্ধি

আলুর 'চোখ' কাটিয়া মাটিতে বসাইলে কয়েক দিনের মধ্যে কুঁড়ি ফুটিয়া ছোট ছোট পাতা বাহির হইবে। কুঁড়ির নিম্নভাগ হইতে শিকড় বাহির হইয়া মাটিতে প্রবেশ করিবে। আমাদের চোখে না পড়িলেও শিকড় মাটি হইতে রস টানিতে সুরু করে এবং সবুজ কাঁচ পাতাগুলি খাদ্য প্রস্তুত করিতে থাকে। খাদ্য পাইয়া গাছটি দিনে দিনে বাড়িতে থাকে। ইহাকে বলা হয় **বৃদ্ধি**।

এককোষী উদ্ভিদ ও প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া বহুকোষী উদ্ভিদ ও প্রাণী সকলেই বৃদ্ধিলাভ করে। অ্যামিবা, প্যারামিসিয়াম, ঈষ্ট ধীরে ধীরে বড় হয়। বৃদ্ধি শেষ সীমায় পেঁছাইলে কোষ বিভক্ত হইয়া দুইটি কোষে পরিণত হয়। বট, অশ্বথ, নারিকেল প্রভৃতি গাছগুলি বৃদ্ধি পাইয়া মহীরুহে পরিণত হয়। আঠের হইতে কুড়ি বছর বয়সের মধ্যে আমাদের বৃদ্ধি সম্পূর্ণ হয়।

চলতি কথায় বৃদ্ধি বলতে বোঝায় বড় হওয়া। কিন্তু জীববিজ্ঞানীর কাছে বৃদ্ধি বলতে আরও বেশী কিছু বোঝায়। উদ্ভিদ সালোক সংশ্লেষ দ্বারা শর্করা প্রস্তুত করে। ইহার কিছু অংশ দেহ গঠনে, কিছু অংশ শক্তি উৎপাদনে ব্যয়িত হয়। উদ্বৃত্ত শর্করা ভবিষ্যতের জন্য কোষে সঞ্চিত থাকে অথবা শিশু উদ্ভিদের জন্য বীজের মধ্যে জমা থাকে।

শর্করা শ্বেতসাররূপে আলুর কোষগুলিতে জমা থাকে। বৃদ্ধি বলতে যা' বোঝায় তা আলুর কোষে দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে আলু বা রাঙা আলুকে শ্বেতসারের বস্তার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কোষের মধ্যে ঠাসা-ঠাসি শ্বেতসার কণা থাকে। প্রোটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস একধারে পড়িয়া থাকে। জীব বিজ্ঞানীর কাছে বৃদ্ধি বলিতে যা' বোঝায় তা' দেখা যায় মূল, কাণ্ড ও পাতার কোষগুলিতে। গাছের এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিতে খাদ্য কেবল গুদামজাত করা থাকে না। উহাদের কোষগুলিতে খাদ্যবস্তু প্রোটোপ্লাজমে পরিবর্তিত হয়। প্রোটোপ্লাজম পুরাতন কোষগুলি মেরামত করে, নূতন কোষ গঠন করে অথবা কোষ-প্রাচীর তৈরী করিয়া গাছের দেহ শক্ত করে, আকৃতি প্রদান করে। সুতরাং বৃদ্ধি এমন একটি প্রক্রিয়া যাহার দ্বারা জীবদেহ গঠিত হয় এবং আকারে বড় হয়।

গাছের বৃদ্ধি কোন কোন জিনিষের উপর নির্ভর করে

গাছের বৃদ্ধি নির্ভর করে প্রোটোপ্লাজমের সক্রিয়তার উপর। অতএব যে জিনিসগুলি প্রোটোপ্লাজমকে সক্রিয় রাখে গাছের বৃদ্ধি নির্ভর করে তাহাদের উপর। গাছের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি নিম্নে আলোচিত হইল।

খাদ্য—খাদ্য হইতে প্রোটোপ্লাজম, কোষ-প্রাচীর এক কথায় নূতন কোষ উৎপন্ন হয়। ক্রমাগত নূতন কোষ সৃষ্টির ফলে উদ্ভিদের কলেবর বৃদ্ধি হয়। খাদ্য সরবরাহ বিঘ্নিত হইলে বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। ইহা ছাড়া খাদ্য প্রোটোপ্লাজমকে শক্তি সরবরাহ করে। গতীয় শক্তির প্রভাবে প্রোটোপ্লাজম যাবতীয় বিপাকীয় কার্য সম্পন্ন করে।

জল—কোষের প্রোটোপ্লাজমে জলের পরিমাণ বেশী থাকিলে উহার কার্যক্ষমতা বাড়িয়া যায়। যেমন, শুকনো বীজে জলের পরিমাণ কম থাকায় উহার প্রোটোপ্লাজম প্রায় সুপ্ত অবস্থায় থাকে। বাষ্পমোচন প্রক্রিয়ায় গাছের দেহ হইতে জল বাহির হইয়া যায়। প্রোটোপ্লাজমকে সক্রিয় রাখিতে হইলে কোষে নির্দিষ্ট মাত্রায় জল থাকা প্রয়োজন।

অক্সিজেন—শ্বাসের জন্য অক্সিজেন অপরিহার্য। অক্সিজেনের উপস্থিতিতে শর্করা খাদ্য জারিত হয়। খাদ্যে নিহিত স্থৈতিক শক্তি গতীয় শক্তিরূপে বাহির হইয়া আসে। নির্গত শক্তির দ্বারা প্রোটোপ্লাজম জৈবনিক কার্যগুলি সমাধা করে। অক্সিজেনের অভাবে প্রোটোপ্লাজম শক্তি পায় না, নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে।

তাপ—অতিরিক্ত ঠান্ডায় প্রোটোপ্লাজমের কার্যক্ষমতা কমিয়া যায়। অতিরিক্ত গরমে যেমন, ৬০° সেণ্টিগ্রেড বা তার উপরে প্রোটোপ্লাজম মরিয়া যায়। মাঝামাঝি তাপ যেমন, ২৮°—৩০° সেণ্টিগ্রেড প্রোটোপ্লাজমের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল। এই তাপে প্রোটোপ্লাজম সবচেয়ে বেশী সক্রিয় থাকে। তাপের তারতম্যে প্রোটোপ্লাজমের কাজের তারতম্য ঘটে।

আলোক—বৃদ্ধির প্রথমাবস্থায় আলোকের প্রয়োজন না থাকিলেও আলোকের অভাবে উদ্ভিদদেহের গঠন ও বৃদ্ধি সম্পূর্ণ হয় না। আলোকের অভাবে ক্লোরোফিল বিনষ্ট হয়। পত্ররন্ধ্র বন্ধ থাকে। ফলে খাদ্য উৎপন্ন হয় না। খাদ্য না পাইলে প্রোটোপ্লাজমের কাজ বন্ধ হইয়া যায়। উদ্ভিদদেহ শীর্ণ হইয়া পড়ে; ফুল, ফল ধারণ করিতে পারে না। সুতরাং আলোক না থাকা উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকর।

হরমোন—মূল ও কাণ্ডের আগার কোষগুলি হইতে হরমোন উৎপন্ন হয়। ইহার প্রভাবে মূল ও কাণ্ড দৈর্ঘ্যে বড় হয়।

আমাদের বৃদ্ধি কার উপর নির্ভর করে?

উদ্ভিদের মত মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী বৃদ্ধিলাভ করে। সুষম খাদ্য গ্রহণ না করিলে আমাদের দেহ সুগঠিত হয় না। খাদ্যে ভিটামিন 'এ' না থাকিলে বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। মস্তিষ্কের পিটুইটারী গ্রন্থি আমাদের দেহের বৃদ্ধির নিয়ামক তাহা তোমরা জান। দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি নির্ভর করে পিটুইটারী গ্রন্থির স্বাভাবিক কাজকর্মের উপর। এই গ্রন্থির সক্রিয়তা কম হইলে দেহ খর্ব হয় এবং বেশী হইলে দেহ অস্বাভাবিক লম্বা হয়।

জনন

বেশী দিনের কথা নহে, আজ হইতে তিনশ' বছর আগেও নূতন জীবন-সৃষ্টি সম্পর্কে মানুষের মনে নানারকম কুসংস্কার বদ্ধমূল ছিল। বর্ষাকালে ভিজা মাটি বা ভিজা দেওয়ালে গাছ জন্মায়, পুকুরে জন্মলাভ করে ব্যাঙ। এই সব দেখিয়া মানুষ ভাবিত মাটি গাছের জন্ম দেয়, ব্যাঙ জন্মগ্রহণ করে মাটি হইতে। কেবল সাধারণ মানুষ নহে, অনেক গুণী, জ্ঞানী, দার্শনিক এই মত পোষণ করিতেন। গমের দানা সমেত ময়লা, ছেঁড়া কম্বল শুকনো জায়গায় রাখিয়া দিলে কম্বল ইঁদুরে পরিণত হইবে—এ কথা বলিয়াছিলেন বেলজিয়ামের এক চিকিৎসক। এই উক্তির বিরুদ্ধতা প্রকাশ করেন এক ইংরাজ লেখক। তাঁর মতে ইঁদুর আসিয়াছে মিশরের নীল নদের মাটি হইতে। পচনশীল জৈব পদার্থ মশা, মাছির জন্ম দেয়, এই ধারণা পোষণ করিতেন সেকালের সেরা গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্‌টট্‌ল।

এই সব প্রচলিত কুসংস্কারের মূলে সর্বপ্রথম কুঠারাঘাত করেন ফ্রানচেসকো রেডি নামে ফ্লোরেন্সের এক চিকিৎসক। মশা ও মাছি যে ডিম হইতে জন্মায়, পচনশীল জৈব পদার্থ হইতে নহে, ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে রেডি তাহা প্রমাণ করেন। আরও অনেকে এই ধরণের গবেষণা করেন। শেষে ফরাসী দেশের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক লুই পাস্তুর ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে আরও নির্ভুলভাবে পরীক্ষা চালাইয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন। জীবন হইতেই যে জীবন সৃষ্টি সম্ভব, কাদা-মাটি হইতে নহে, লুই পাস্তুর এই কথা ঘোষণা করিলেন। এখন আমরা জানি, নূতন জীব আসে পুরাতন জীব হইতে; নূতন কোষ সৃষ্টি হয় পুরাতন কোষ হইতে।

যে পদ্ধতিতে পুরাতন জীব হইতে নূতন জীব জন্মলাভ করে তাহাকে বলা হয় জনন। এককোষী হইতে বহুকোষী উদ্ভিদ ও প্রাণী সকলেই জনন দ্বারা বংশ বৃদ্ধি করে। উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই কার্য সম্পন্ন হয়।

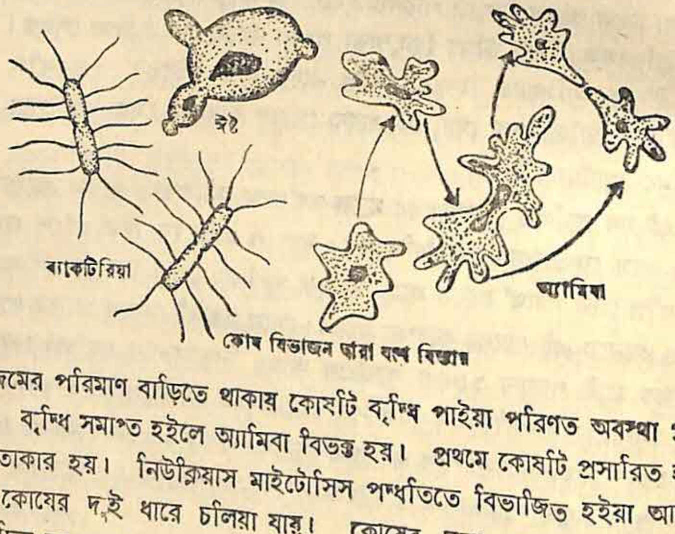
অনেকে কোষ বিভাজন দ্বারা বংশ বিস্তার করে

ব্যাকটিরিয়া ও কতকগুলি শৈবাল খুব সহজ উপায়ে নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। পরিণত কোষের মাঝখানে একটি খাঁজ দেখা দেয়। এই অঞ্চলে প্রোটো-প্লাজম সংকুচিত হইতে থাকে এবং পরিশেষে নিউক্লিয়াস সমেত কোষটি কাটিয়া

দুই ভাগ হইয়া যায়। প্রত্যেক অর্ধাংশ বৃদ্ধি পাইয়া ব্যাকটিরিয়ায় পরিণত হয়।

এককোষী ছত্রাক ঈষ্টের বিভাজন পদ্ধতি ব্যাকটিরিয়া অপেক্ষা কিছুটা অন্য ধরণের। প্রথমে ঈষ্টের ডিম্বাকৃতি কোষের এক স্থান ফুলিয়া উঠে। মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস কাটিয়া দুই ভাগ হয়। এক ভাগ মাতৃকোষে থাকে অন্য ভাগ ফোলা অংশে প্রবেশ করে। ফোলা অংশটি অপত্য কোষ। অপত্য কোষ মাতৃকোষের গায়ে আটকাইয়া থাকিতে পারে অথবা বিচ্ছিন্ন হইতে পারে। যেভাবেই থাক, কোষটি বড় হইয়া ঈষ্টে পরিণত হয়।

অ্যামিবার কোষ বিভাজন ব্যাকটিরিয়ার মত সহজভাবে হয় না। প্রাণীটি প্রতিদিন যে খাদ্য গ্রহণ করে তাহা প্রোটোপ্লাজমে পরিবর্তিত হয়। প্রোটো-



কোষ বিভাজন দ্বারা বংশ বিস্তার

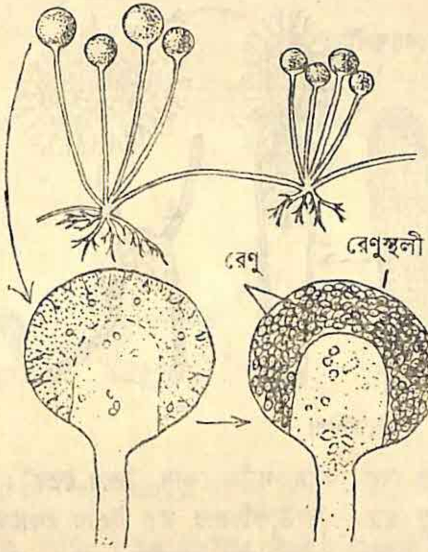
প্লাজমের পরিমাণ বাড়িতে থাকায় কোষটি বৃদ্ধি পাইয়া পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বৃদ্ধি সমাপ্ত হইলে অ্যামিবা বিভক্ত হয়। প্রথমে কোষটি প্রসারিত হইয়া আয়তাকার হয়। নিউক্লিয়াস মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হইয়া আয়তাকার কোষের দুই ধারে চলিয়া যায়। কোষের মাঝ বরাবর প্রোটোপ্লাজম সঙ্কুচিত হয় এবং শেষে কাটিয়া দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক অর্ধাংশ নূতন অ্যামিবায় পরিণত হয়। ইহারা পুনরায় খাদ্য গ্রহণ করিয়া বড় হয় এবং আগের মত বিভক্ত হইয়া নূতন প্রাণীর সৃষ্টি করে।

লক্ষ্য করিলে দেখিবে, অ্যামিবার মাতৃকোষের মৃত্যু নেই। কারণ মাতৃকোষ অপত্য কোষ দুইটির মধ্যে নূতনভাবে জীবনকে ফিরিয়া পায়। অ্যামিবাকে কি অমর বলা যাইবে?

অনেকে রেণু দ্বারা নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে

ছত্রাক : কতকগুলি এককোষী প্রাণী ও অনেক বহুকোষী উদ্ভিদ ছোট ছোট কোষ বা রেণুর সাহায্যে বংশ বিস্তার করে। বর্ষাকালে পাউরুটি ফেলিয়া

রাখিলে কয়েকদিনের মধ্যে উহার উপর মাকড়সার জালের মত জিনিস জন্মাইতে দেখা যায়। উহা পাউরুটির ছত্রাক বা মিউকরের ছত্রাকদেহ। বিবর্ধক লেন্স দ্বারা দেখিলে ছত্রাকদেহে অনেকগুলি খাড়া অণুসূত্র দেখা যায়। ইহাদের আগা বলের মত। বলের মধ্যে প্রোটোপ্লাজম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় বিভক্ত হয়। প্রত্যেক



পাউরুটির ছত্রাক মিউকর

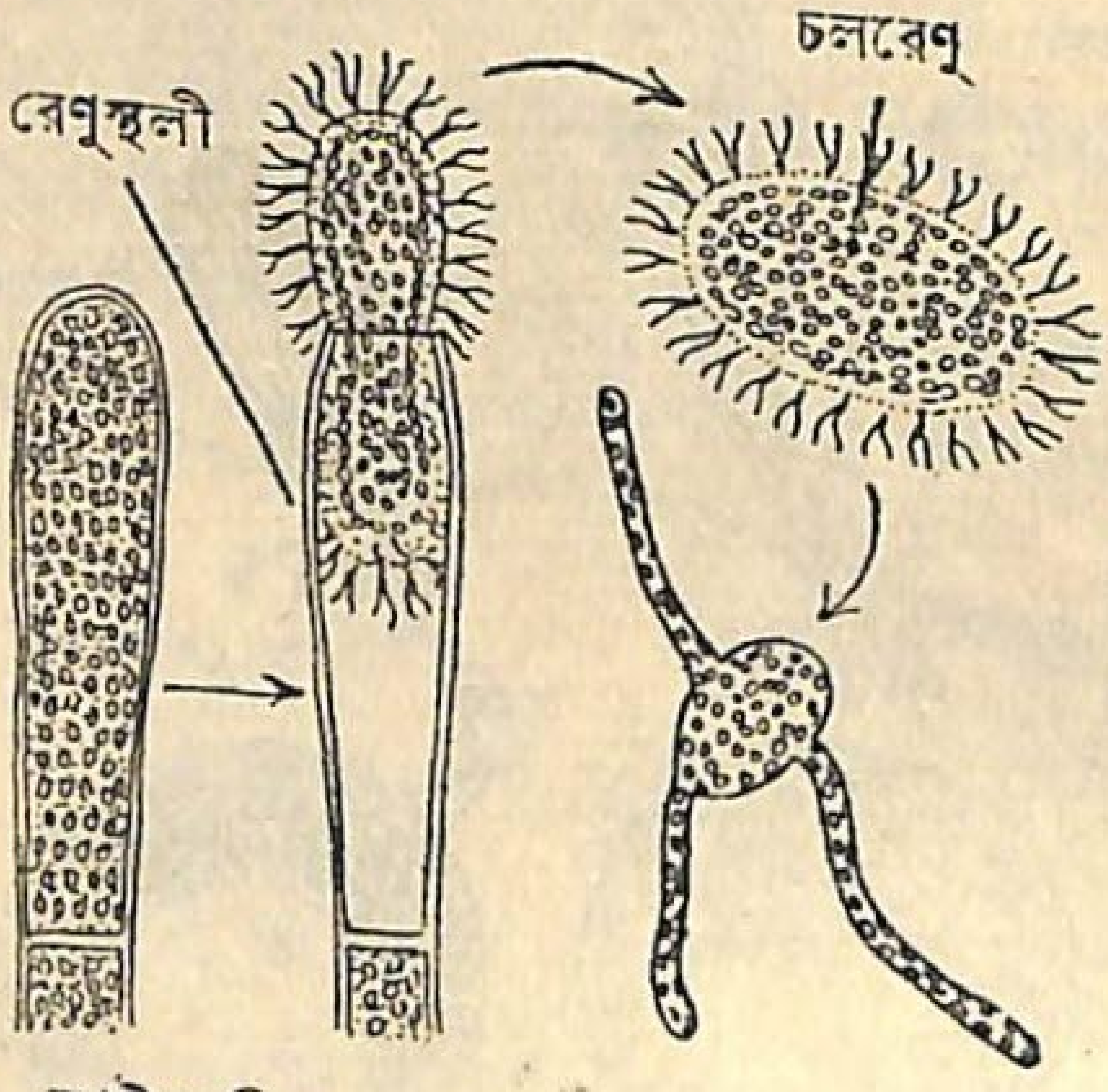
কণায় একটি নিউক্লিয়াস থাকে। নিউক্লিয়াসযুক্ত প্রোটোপ্লাজমের কণাকে রেণু বলে। রেণুগুলি এককোষী। যে বলের মধ্যে রেণু তৈরী হয় তাহাকে বলা হয় রেণুস্থলী। রেণু পরিপক্ক হইলে রেণুস্থলী ফাটিয়া যায় এবং রেণুগুলি বাতাসে উড়িয়া যায়। অন্য রুটির উপর পড়িলে রেণু হইতে নূতন ছত্রাকদেহ বাহির হয়।

মিউকরের ন্যায় ব্যাঙের ছাতা হইতে রেণু উৎপন্ন হয়। ব্যাঙের ছাতার উপর দিকের চ্যাপ্টা থালার মত অংশটি কাটিয়া সাদা কাগজের উপর রাখিয়া দাও। দশ-বারো ঘণ্টা পর কাগজের উপর অসংখ্য রেণু দেখিতে পাইবে। রেণু বাতাসে উড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায় এবং উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলে উহা হইতে নূতন ব্যাঙের ছাতা জন্মায়।

শৈবাল : অনেক শৈবাল রেণু উৎপাদন করে। পুকুরের মিঠা জলে বসবাসকারী **ভাউকেরিয়া** শৈবালের বিচলনের কথা তোমরা পূর্বে শুনিয়াছ। ভাউকেরিয়ার সূত্রবৎ দেহের আগার দিকে একটি প্রাচীর পড়িয়া ঐ অংশকে দেহের বাকী অংশ হইতে পৃথক করিয়া ফেলে। পৃথক অংশের প্রোটোপ্লাজম

কোষ-প্রাচীর হইতে সরিয়া আসিয়া একটি ডিম্বাকার রেণুতে পরিণত হয়। রেণুর গা হইতে অনেকগুলি সিলিয়া বাহির হয়। রেণুস্থলী ফাটিয়া গেলে রেণুটি বাহির হইয়া সিলিয়ার দ্বারা জলে সাঁতার কাটে এবং অন্যত্র গিয়া নূতন ভাউকেরিয়ার জন্ম দেয়।

পুকুরের জলে ইউলোথ্রিক্স্ নামে আর একটি সবুজ রঙের শৈবাল পাওয়া



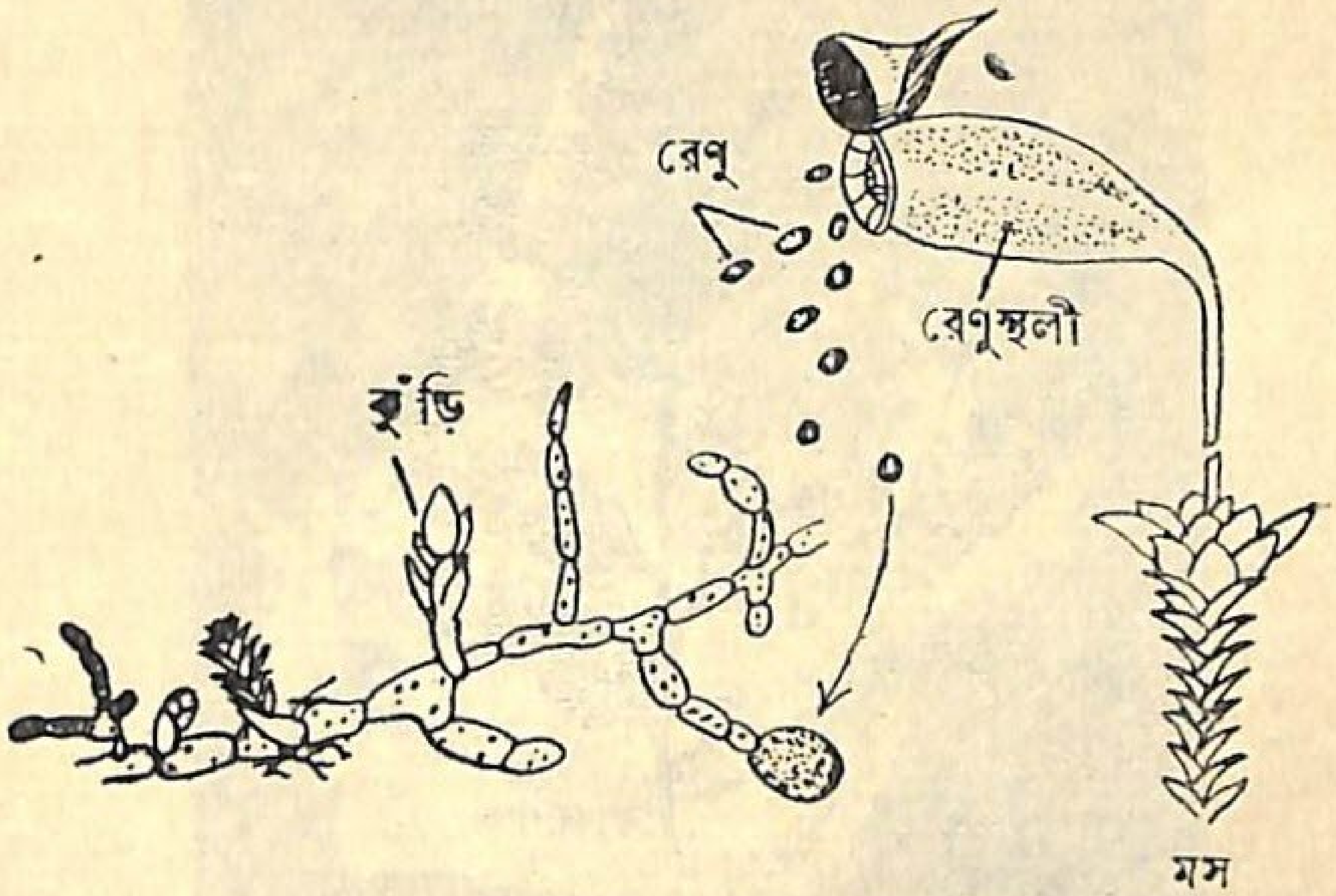
ভাউকেরিয়া

যায়। ইহার সূত্রবৎ দেহ অনেকগুলি কোষ দিয়ে তৈরী। কোষ বিভাজন দ্বারা শৈবালটি বড় হয়। ভাউকেরিয়ার মত ইহার কোষের প্রোটোপ্লাজম কোষ-প্রাচীর হইতে সরিয়া আসে এবং বিভাজিত হয়। ফলে প্রোটোপ্লাজম দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়। খণ্ড দুইটি আবার বিভাজিত হইয়া চারটি অথবা আটটি খণ্ডে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক খণ্ডে একটি নিউক্লিয়াস থাকে। প্রত্যেক খণ্ড হইতে দুই জোড়া সিলিয়া বাহির হয়। সিলিয়াযুক্ত কোষগুলি ইউলোথ্রিক্স্-এর রেণু। রেণুস্থলীর দেওয়াল বিনষ্ট হইলে রেণুগুলি মুক্ত হয় এবং সিলিয়ার দ্বারা জলে সাঁতার কাটিতে থাকে। পরে সিলিয়া অন্তর্হিত হয় এবং রেণু হইতে নূতন শৈবাল জন্মলাভ করে।

ভাউকেরিয়া, ইউলোথ্রিক্স্ প্রভৃতি শৈবালের রেণুগুলি সিলিয়ার দ্বারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতে পারে বলিয়া ইহাদের চলরেণু বলা হয়।

মস ঃ বর্ষাকালে ভিজা দেওয়ালে সবুজ ভেলভেটের মত আবরণ হইতে তোমরা হয়ত মস গাছ সংগ্রহ করিয়া থাকিবে। লক্ষ্য করিলে মস গাছের মাথায় চুলের মত সরু একটা জিনিস দেখিতে পাইবে। দেখিতে কুর্চের মত। মসের মাথায় কুর্চের মত জিনিসটি দেখিলে, ইহার যে রেণু উৎপাদনের কাজ শেষ হইয়াছে তাহা বোঝা যায়। দেওয়ালের অন্যান্য স্থানে খোঁজ করিলে দেখিবে

কূর্চের আগায় একটি স্ফীত অংশ রহিয়াছে। এই স্ফীত অংশটি রেণুস্থলী। রেণুস্থলী শুকাইয়া গেলে খসিয়া পড়ে। তখন মসের আগায় কেবল কূর্চটি আটকাইয়া থাকে। পাকা রেণুস্থলী টিপিলে উহার মাথার দিক দিয়া রেণু বাহির হইয়া আসে। স্লাইডে এক ফোঁটা জল দিয়া রেণুগুলি লইয়া মাইক্রসকোপে দেখিলে জীবিত রেণুগুলি দেখিতে পাইবে। রেণুগুলি এককোষী। রেণুস্থলীর রেণু উৎপাদনকারী কোষগুলি বিভাজিত হইয়া রেণু উৎপন্ন করে।



মসের (স্ত্রী গাছের) আগায় রেণুস্থলী জন্মায়

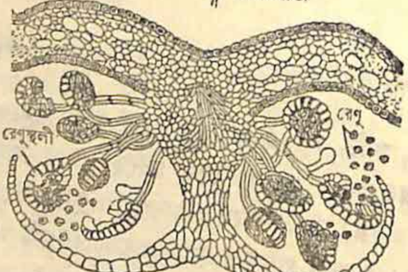
ভিজা দেওয়াল, মাটি, গাছের গুঁড়ির উপর পড়িয়া থাকা রেণু অনুকূল আবহাওয়ায় অঙ্কুরিত হয়। প্রত্যেক রেণু হইতে প্রথমে শৈবালের মত সূত্রবৎ একটা জিনিস বাহির হয়। উহার গায়ে অনেকগুলি কুঁড়ি উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক কুঁড়ি বৃদ্ধি পাইয়া মস গাছে পরিণত হয়। সূত্রবৎ অংশটি মরিয়া গেলে গাছগুলি পৃথক হইয়া যায়। মস গাছে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে।

ফার্ন ঃ ফার্ণের পাতার নীচের পিঠে কোন কোন সময়ে তামাটে বা কালো রঙের অসংখ্য ফুটকি দেখে থাকবে। কাঁচা অবস্থায় ঐগুলির রঙ সবুজ থাকে। অনেকের ধারণা এটা পাতার এক রকম রোগ। কিন্তু তা নহে। বিবর্ধক লেন্স দ্বারা দেখিলে প্রত্যেক ফুটকির মধ্যে অনেকগুলি গোলাকার বস্তু দেখিতে পাইবে। গোলাকার বস্তুগুলি এক একটি রেণুস্থলী। রেণুস্থলীগুলি একটি পাতলা, স্বচ্ছ ছাতার মত আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে। রেণুস্থলীর মধ্যে রেণু উৎপন্ন হয়। রেণুস্থলী যখন ফাটে, রেণুগুলি গাছ হইতে বেশ কিছুটা দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। ভিজা মাটি, দেওয়াল, গাছের গুঁড়ি, প্রস্তর খণ্ডের উপর পড়িলে রেণু অঙ্কুরিত হয়। অঙ্কুরোদ্গমের ফলে রেণু হইতে পান পাতার মত একটি সবুজ রঙের গাছ বাহির হয়। আকৃতি পান পাতার মত হইলেও

ইহার আয়তন তোমার হাতের কড়ে আংগুলের নখের অর্ধেক। বিবর্ধক লেন্সের সাহায্যে ইহাদের অনায়াসে খুঁজিয়া বাহির করা যায়। এই গাছের সঙ্গে ফার্ণ গাছের কোন মিল নাই। ইহাকে বলা হয় লিংগধর উদ্ভিদ। নূতন ফার্ণ



ফার্ণের পাতা



ফার্ণের পাতার প্রস্থচ্ছেদ

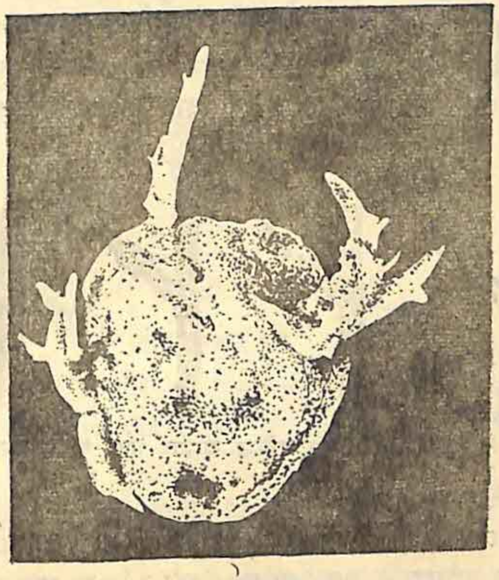
গাছের জন্ম দেওয়া ইহার একমাত্র কাজ। লিংগধর উদ্ভিদ হইতে কিভাবে ফার্ণ গাছ জন্মায় তাহা পরে আলোচিত হইয়াছে।

অংগজ জনন বংশবৃদ্ধির আর একটি উপায়

ভারত, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে সাদা ব্যাঙের ছাতা চাষ করা হয়। সাদা ব্যাঙের ছাতা ভক্ষ্য অন্যগুলি বিষাক্ত। খাদ্যমূল্যের দিক দিয়া ভক্ষ্য ব্যাঙের ছাতা বাঁধাকপির সমান। চাষ করিবার সময়ে ব্যাঙের ছাতার রেণু ব্যবহার করা হয় না। ব্যাঙের ছাতার যে অংশ মাটির নীচে থাকে তাহা টুকরা টুকরা করিয়া জমিতে লাগান হয়। প্রত্যেক খণ্ড হইতে ব্যাঙের ছাতা বাহির হয়। ইহাকে বলে অংগজ জনন। অর্থাৎ দেহের একটি অঙ্গ বা ছোট একটি

অংশ হইতে উদ্ভিদের উৎপত্তি হয়। উদ্ভিদ জগতে এই ধরণের জনন অনেক দেখা যায়। যেমন—

আলুর 'চোখ' কাটিয়া মাটিতে বসাইয়া দাও। কয়েকদিন পর উহা হইতে মুকুল বাহির হইবে। মুকুল বড় হইয়া আলুগাছে পরিণত হইবে। আলুর মত আদা, পিঁয়াজ প্রভৃতি মৃদগত কাণ্ড হইতে গাছ বাহির হয়। বীজ লাগাইয়া



১

একটি আলু অঙ্গজ জনন দ্বারা
অনেকগুলি গাছ সৃষ্টি করিতে পারে

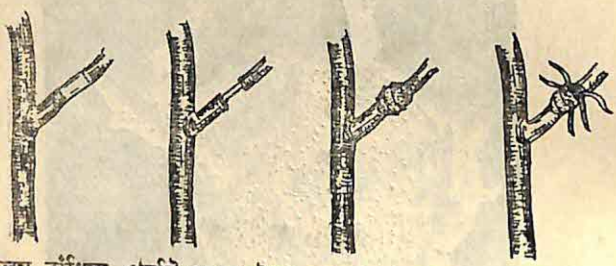
রজনীগন্ধার চাষ করা হয় না। গাছের নীচে পিঁয়াজের মত 'গেঁড়' থাকে। মাটিতে 'গেঁড়' লাগাইলে রজনীগন্ধার গাছ পাওয়া যায়।

রাঙাআলুগুলি ঐ গাছের অস্থানিক মূল। খাদ্য জমা হওয়ায় মূলগুলি স্ফীত হয়। রাঙাআলু টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া মাটিতে বসাইয়া দিলে উহা হইতে গাছ বাহির হয়। পটল গাছের মূলে মুকুল থাকে। মুকুল হইতে গাছ বাহির হয়।

রেকাবে জল দিয়া একটি পাথরকুচির পাতা রাখিয়া দাও। কিছুদিন পর উহার কিনারা হইতে মুকুল বাহির হইবে। প্রত্যেক মুকুলের নীচের দিক হইতে অস্থানিক মূল বাহির হয়। মুকুলগুলি বড় হইয়া পাথরকুচি গাছে পরিণত হয়। শুষনি, আমরুল, দূর্বা, কচু, থানকুনি, চন্দ্রমল্লিকার কাণ্ড অনুভূমিকভাবে মাটির উপর দিয়া বা একটু নীচ দিয়া অগ্রসর হয়। এই কাণ্ডের পর্ব হইতে

কুঁড়ি মাটি ভেদ করিয়া উপরে চলিয়া আসে। কুঁড়ি বৃদ্ধি পাইয়া নূতন গাছে পরিণত হয়। পুকুরের পানা, কচুরী-পানা এইভাবে নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

বর্ষাকালে জবা, স্থলপদ্ম, দোপাটি গাছের ডাল কাটিয়া মাটিতে পুঁতিয়া দিলে ডালের কাটা দিক হইতে শিকড় বাহির হয়। অঙ্গজ জননের সুযোগ লইয়া নার্সারীতে 'কলমের গাছ' তৈরী করা হয়। কলমের গাছের কথা তোমরা শুনিয়া থাকিবে। ভাল জাতের ফুল বা ফল গাছে কলম বাঁধা হয়। ইহাতে একটি গাছ হইতে অনেকগুলি গাছ পাওয়া যায়। কেমনভাবে কলম বাঁধা হয় জান? যে ডালটিকে কলম করা হইবে উহার আগা হইতে এক বা দুই হাত

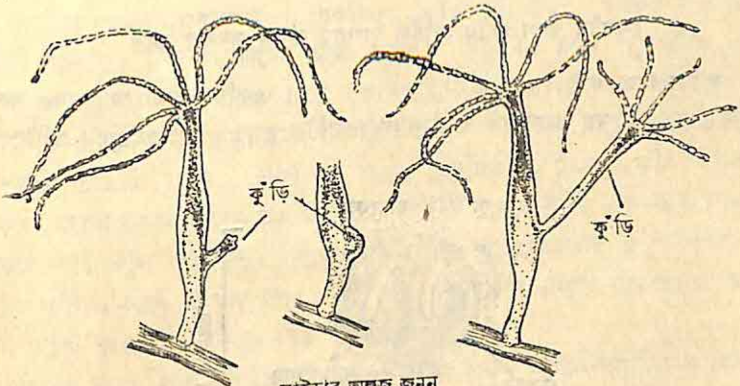


কলম বাঁধিয়া একটি গাছ হইতে অনেক গাছ পাওয়া যাইতে পারে

নীচে ২-৩ সেণ্টিমিটার জায়গা হইতে ছুরি দিয়া ছাল তুলিয়া ফেলা হয়। এইবার কাণ্ডের জাইলেমকে অক্ষত রাখিয়া উহার বাহিরের সমস্ত কলা ছুরি দিয়া সাবধানে কাটিয়া ফেলা হয়। কাটা অংশ মাটি চাপা দিয়া সেলোফিন কাগজ দিয়া মুড়িয়া দেওয়া হয়। কিছুদিন পর ঐ স্থান হইতে অস্থানিক মূল বাহির হইয়া আসে। তখন মূল সমেত ডালটি মাতৃগাছ হইতে কাটিয়া মাটিতে পুঁতিয়া দেওয়া হয়। কলমের গাছ অনেক তাড়াতাড়ি এবং বেশী পরিমাণে ফুল ও ফল দেয়। বীজের উপর নির্ভর না করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে মাতৃগাছের অনুরূপ অসংখ্য গাছ উৎপাদন করা যায়। তবে এইরূপ জননে অসুবিধাও আছে। যেমন, একটি গাছ হইতে যে কলম পাওয়া গেল তাহা বড় হইলে সেই গাছ হইতেও কলম তোলা যাইবে। এইভাবে পর পর কলম তুলিয়া গেলে মাতৃগাছের প্রোটোপ্লাজম একভাবে এক গাছ হইতে অন্য গাছে চলিয়া আসিবে। ইহাতে প্রোটোপ্লাজম 'বুড়া' হইয়া যায় অর্থাৎ জীবনীশক্তি কমিয়া আসে। এইরূপ গাছ হইতে অধিক ফলন আশা করা যায় না। সেই কারণে মধ্যে মধ্যে বীজ হইতে উৎপন্ন গাছের কলম সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

অঙ্গজ জনন যে কেবলমাত্র উদ্ভিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাহা নহে। অনেক নিম্নশ্রেণীর প্রাণী এই পদ্ধতিতে সংখ্যা বৃদ্ধি করে। স্পঞ্জ, প্রবাল, জেলিফিস,

হাইড্রা মুকুল দ্বারা নূতন প্রাণীর জন্ম দেয়। হাইড্রার গা সাধারণতঃ মসৃণ থাকে। অনেক সময়ে গাত্রের এক স্থানে কোষ বিভাজন হওয়ায় ঐ স্থান ফুলিয়া উঠে। স্ফীত অঞ্চলকে কুঁড়ি বলা হয়। কুঁড়ি দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পায়।



হাইড্রার অঙ্গজ জনন

ইহার আগায় মুখছিদ্র, কর্ষিকা গঠিত হইয়া নূতন হাইড্রায় পরিণত হয়। নূতন হাইড্রা মাতৃ হাইড্রার দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করে।

দৈবাৎ অঙ্গহানি হইলে অঙ্গজ জনন দ্বারা সেই অঙ্গ পুনর্গঠিত হয়। কেঁচোর দেহ লেজের দিকে কাটিয়া দিলে উহা মরে না। দেহের হারান অংশ পুনর্গঠিত হয়। ইহাকে বলা হয় পুনরুৎপত্তি। তারামাছের বাহু ভাঙ্গিয়া দিলে সেই স্থানে নূতন বাহুর উৎপত্তি ঘটে। তারামাছকে দেহের মাঝ বরাবর ভাঙ্গিয়া দুই টুকরা করিলে প্রত্যেক টুকরা বৃদ্ধি পাইয়া তারামাছে পরিণত হয়। জীবিত স্পঞ্জের দেহের টুকরা হইতে দুই-তিন বছরের মধ্যে স্বাভাবিক আকারের স্পঞ্জ পাওয়া যায়।

পুনরুৎপত্তি নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদেহে ঘটে, উচ্চতর প্রাণীতে হয় না। দুর্ঘটনায় হাত, পা বা আঙ্গুল যদি কাটা পড়ে তবে মানুষ অঙ্গজ জনন দ্বারা উহা সৃজন করিতে পারে না। কেবলমাত্র আমাদের গাত্রচর্ম ক্ষতিগ্রস্ত হইলে ক্ষতস্থানে নূতন চর্ম পুনর্গঠিত হইতে পারে।

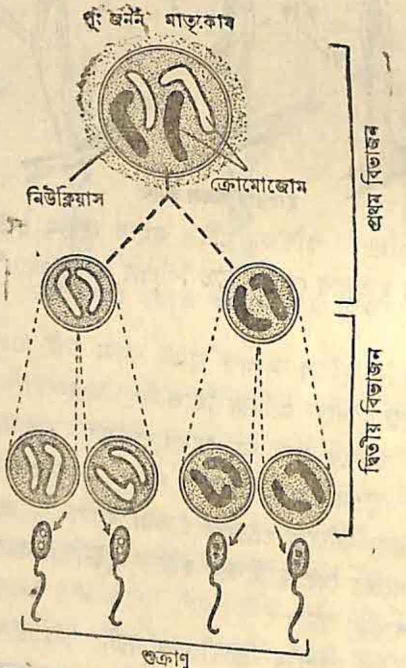
যে জনন পদ্ধতির কথা উপরে বিবৃত করা হইল ইহাদের প্রত্যেকের মূলে রহিয়াছে কোষ বিভাজন। কোষ বিভাজন দ্বারা একটি অ্যামিবা দুইটি অ্যামিবার জন্ম দেয়। হাইড্রার দেহে কোষ বিভাজনের ফলে কুঁড়ি উৎপন্ন হয়। শৈবাল, ছত্রাক, মস, ফার্ণ প্রভৃতি উদ্ভিদদেহে বিশেষ বিশেষ কোষ বিভাজিত হইয়া রেণু উৎপাদন করে। ইহাতে আর একটি জিনিস লক্ষ্য করিবার আছে। এইরূপ জননে একটি মাত্র উদ্ভিদ বা প্রাণীদেহ হইতে জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে।

ভিন্ন জননেন্দ্রিয়যুক্ত দুইটি জীবের প্রয়োজন হয় না। জননেন্দ্রিয় ছাড়া বংশ-বৃদ্ধির পদ্ধতিকে অযৌন জনন বলা হয়।

লুই পাস্তুর যে বলিয়াছিলেন জীব জন্মগ্রহণ করে জীব হইতে, তাঁর এই উক্তি কতখানি সত্য তাহা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছ।

বেশীর ভাগ জীব জটিল পন্থায় জনন সম্পন্ন করে

জীবজগতে দুই প্রধান জনন পদ্ধতির মধ্যে একটির কথা তোমাদের বলা হইল। জননেন্দ্রিয় ছাড়া এই জননকার্য সংঘটিত হয়। ইহাতে কোন জটিলতা



পুংজনন মাতৃকোষ মায়োসিস পদ্ধতিতে বিভক্ত হইয়া পুংজনন কোষ বা শুক্রাণু সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবে স্ত্রীজনন মাতৃকোষ ডিম্বাণু সৃষ্টি করে। যৌন জননে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু একত্রে মিলিত হইয়া নূতন জীব সৃষ্টি করে।

নাই। অযৌন পদ্ধতি ছাড়া আর এক উপায়ে উদ্ভিদ ও প্রাণী নিজেদের বংশ বৃদ্ধি করে। এই পদ্ধতিতে জননেন্দ্রিয় অংশ গ্রহণ করে বলিয়া ইহাকে যৌন-জনন বলা হয়। যৌনজননে দুই প্রকার জননেন্দ্রিয় হইতে জননকোষ উৎপন্ন

হয়। জননকোষ দুইটি একত্রে মিলিত হইয়া একটি নূতন কোষ সৃষ্টি করে। শেষোক্ত কোষটি বিভাজিত হইয়া নূতন জীবের জন্ম দেয়।

উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে জননেন্দ্রিয় দুইভাবে থাকে। দুই প্রকার জননেন্দ্রিয় এক জীবদেহে থাকিতে পারে অথবা দুই পৃথক জীবদেহে থাকিতে পারে। সেই অনুসারে জীবটিকে **দ্বিলিঙ্গ** বা **একলিঙ্গ** জীব বলা হয়। আদর্শ ফুলের চারিটি স্তবকের কথা তোমাদের মনে আছে। ইহাদের মধ্যে পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক ফুলের জননেন্দ্রিয় এবং বাকী দুইটি স্তবক সাহায্যকারী অংগ। পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক ছাড়া বীজ উৎপন্ন হয় না। দ্বিলিংগ ফুলে পুংস্তবক স্ত্রীস্তবক উভয়েই থাকে। একলিংগ ফুলে ইহাদের যে কোন একটি স্তবক থাকে। ফুলে কেবল পুংস্তবক থাকিলে উহাকে পুরুষ ফুল এবং স্ত্রীস্তবক থাকিলে স্ত্রী ফুল বলা হয়। পুংস্তবক হইতে পুংজননকোষ ও স্ত্রীস্তবক হইতে স্ত্রীজননকোষ উৎপন্ন হয়। এই দুই জননকোষ একত্রে যুক্ত হইয়া যে কোষ সৃষ্টি করে উহা হইতে বীজ উৎপন্ন হয়।

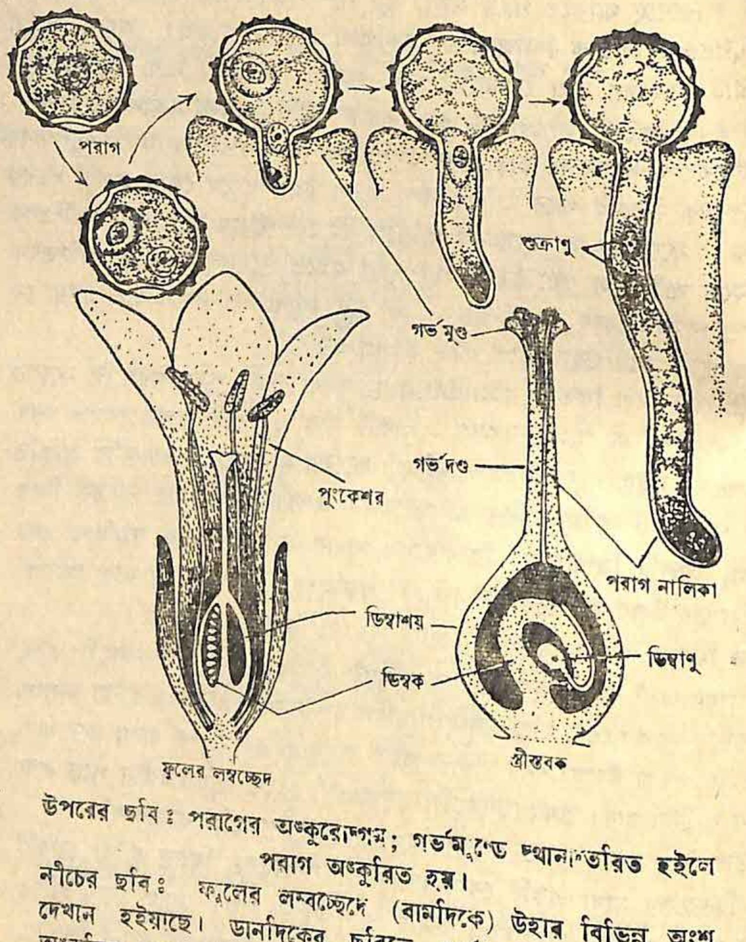
ফুলের মধ্যে কিভাবে বীজ উৎপন্ন হয় দেখা যাক। পুংকেশরগুলি ফুলের পুংজননেন্দ্রিয় বা পুংজনন অংগ। একটি **দন্ড** ও ইহার মাথায় স্ফীত অংশ **পরাগধানী** লইয়া পুংজনন অংগ গঠিত। ফুলের মাঝখানে ফুলদানীর আকৃতি যুক্ত গর্ভপত্রটি স্ত্রীজননেন্দ্রিয় বা স্ত্রীজনন অংগ। গর্ভপত্রের নীচের দিকে ফোলা অংশটি **ডিম্বাশয়**। ডিম্বাশয়ের মাথায় লাগান দন্ডটি **গর্ভদন্ড** এবং গর্ভদণ্ডের উপর প্রান্তে চটচটে পিণ্ডটি **গর্ভমুণ্ড**। ডিম্বাশয়ের মধ্যে অনেক-গুলি **ডিম্বক** থাকে। ডিম্বকে একটি ছিদ্র বা ডিম্বক-রন্ধ্র আছে।

পরাগধানী কাঁচা অবস্থায় সবুজ থাকে। উহার মধ্যে অনেকগুলি রেণু মাতৃকোষ থাকে। রেণু মাতৃকোষগুলি মায়োসিস পদ্ধতিতে বিভক্ত হইয়া অসংখ্য রেণু বা পরাগ উৎপন্ন করে। পরাগধানী পাকিলে হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং শেষে ফাটিয়া যায়। তখন রেণুগুলি পরগাধানী হইতে বাহির হইয়া পড়ে এবং বিভিন্ন উপায়ে গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হয়। পরাগগুলি এককোষী।

ডিম্বকের মধ্যে একটি কোষ মায়োসিস পদ্ধতিতে বিভক্ত হইয়া চারিটি কোষ সৃষ্টি করে। ইহার মধ্যে তিনটি কোষ মরিয়া যায়। চতুর্থ কোষ হইতে স্ত্রীজননকোষ বা **ডিম্বাণু** উৎপন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে ডিম্বকটি একটি ডিম্বাণু ও ইহাকে ঘিরিয়া অসংখ্য কোষ দ্বারা গঠিত।

পরাগ গর্ভমুণ্ডে পড়িলে উহার বৃদ্ধি সুরু হয়। পরাগকোষের নিউ-ক্লিয়াস মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভক্ত হইয়া দুইটি নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। পরাগ-কোষের এক স্থান নলের আকারে ফুলিয়া উঠে। ইহাকে **পরাগ নালিকা** বলে। একটি নিউক্লিয়াস পরাগ নালিকার মধ্যে প্রবেশ করে। পরাগ নালিকা গর্ভমুণ্ড ও গর্ভদণ্ড ভেদ করিয়া ডিম্বাশয়ে চলিয়া আসে এবং ডিম্বক-রন্ধ্র দিয়া ডিম্বকের

মধ্যে প্রবেশ করে। পরাগ নালিকা যখন লম্বায় বাড়িতে থাকে তখন পরাগ-কোষের দ্বিতীয় নিউক্লিয়াস বিভক্ত হইয়া দুইটি **পুংজনন নিউক্লিয়াস** বা **শুক্রাণু** উৎপন্ন করে। শুক্রাণু দুইটি পরাগ নালিকার আগার দিকে চলিয়া



উপরের ছবি : পরাগের অঙ্কুরোদ্গম; গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হইলে পরাগ অঙ্কুরিত হয়।
নীচের ছবি : ফুলের লম্বচ্ছেদে (বামদিকে) উহার বিভিন্ন অংশ দেখান হইয়াছে। ডানদিকের ছবিতে গর্ভমুণ্ডের উপর তিনটি অঙ্কুরিত পরাগ; উহাদের মধ্যে একটির পরাগ-নালিকা ডিম্বক-রন্ধ্র দিয়া ডিম্বকে প্রবেশ করিয়াছে।

আসে। ডিম্বকের মধ্যে প্রবেশ করিলে পরাগ নালিকার আগা ফাটিয়া যায় এবং একটি শুক্রাণু ডিম্বাণুর সহিত মিলিত হয়। অপর শুক্রাণু ডিম্বাণুর কাছাকাছি আর একটি নিউক্লিয়াসের সহিত যুক্ত হয়। ডিম্বাণুর সহিত শুক্রাণুর মিলনকে বলা হয় **নিষেক বা গর্ভাধান।**

ডিম্বাণু ও শুক্রাণু মিলিত হইয়া যে নিউক্লিয়াস গঠন করে তাহাকে জাইগোট বলা হয়। দ্বিতীয় শুক্রাণু ডিম্বকের আর একটি নিউক্লিয়াসের সহিত মিলিত হইয়া **সস্য নিউক্লিয়াস** গঠন করে। জাইগোট বহুবার বিভক্ত হইয়া ভ্রূণে পরিণত হয়। সস্য নিউক্লিয়াস বহুবার বিভাজিত হইয়া সস্যে পরিণত হয়। একবীজপত্রী বীজে সস্যটি থাকিয়া যায়, দ্বিবীজপত্রী বীজে সস্য খুব শীঘ্র বিনষ্ট হয়। গর্ভাধানের পর ডিম্বক এইভাবে বৃদ্ধি পাইয়া বীজে পরিণত হয়। নিষিক্ত ডিম্বককে বীজ বলে। বীজ হইতে নূতন গাছ জন্মায়।

পরাগ গর্ভমুণ্ডে না পড়িলে বীজ উৎপন্ন হয় না

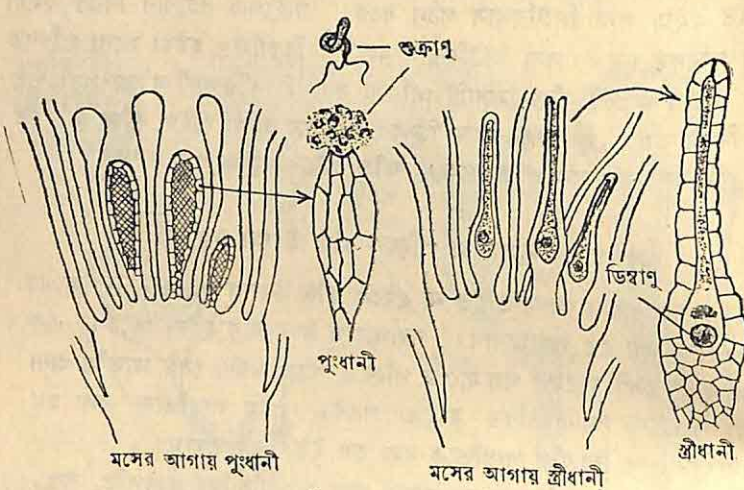
গর্ভমুণ্ডে পরাগ স্থানান্তরিত না হইলে বীজ উৎপন্ন হইবে না। পরাগের স্থানান্তরকে বলা হয় **পরাগযোগ।** পরাগযোগ নানাভাবে হইয়া থাকে। এক ফুলের পরাগ সেই ফুলের গর্ভমুণ্ডে পড়িতে পারে অথবা সেই জাতীয় অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হইতে পারে। প্রথম পদ্ধতিকে বলা হয় স্বপরাগযোগ এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিকে বলা হয় ইতর পরাগযোগ।

ইতর পরাগযোগের জন্য অনেক বাহক থাকে। মৌমাছি, প্রজাপতি, বায়ু, জল প্রভৃতির মাধ্যমে পরাগ এক ফুল হইতে অন্য ফুলে স্থানান্তরিত হয়। ফুলের সুগন্ধ, বর্ণ, মধু প্রভৃতির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া মৌমাছি, প্রজাপতি যখন ফুলে ফুলে ঘুরিয়া বেড়ায় তখন উহাদের গাত্রে পরাগ লাগিয়া যায়। অন্য ফুলে বসিলে উহাদের গা হইতে পরাগ চটচটে গর্ভমুণ্ডে আটকাইয়া যায়। ভুট্টা, পাইন গাছ, ঘাস প্রভৃতি ফুলে বাতাসের সাহায্যে পরাগ স্থানান্তরিত হয়। অনেক জলজ গাছে জল পরাগের বাহক হিসাবে কাজ করে। কোন কোন গাছে শামুক ও পাখীর দ্বারা পরাগযোগ ঘটে।

মসের যৌন জনন

মসের বৃদ্ধি সম্পূর্ণ হইলে উহার আগার দিকে জননেন্দ্রিয় আবির্ভূত হয়। পুং জননেন্দ্রিয়কে **পুংধানী** ও স্ত্রীজননেন্দ্রিয়কে **স্ত্রীধানী** বলা হয়। মস গাছে স্ত্রী পুরুষ ভেদ আছে এ কথা আগে বলা হইয়াছে। পুরুষ মস গাছ পুংধানী এবং স্ত্রী গাছ স্ত্রীধানী বহন করে। পুংধানীর মধ্যে শুক্রাণু ও স্ত্রীধানীর মধ্যে ডিম্বাণু উৎপন্ন হয়। মসের শুক্রাণু সিলিয়াযুক্ত। পুংধানী ফাটিয়া গেলে শুক্রাণুগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে বাহির হইয়া পড়ে। বর্ষাকালে মসের পাতার খাঁজে খাঁজে বৃষ্টির জল থাকায় শুক্রাণু ঐ জলে সাঁতার কাটিয়া স্ত্রীধানীর উন্মুক্ত গ্রীবা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং ডিম্বাণুর সহিত মিলিত হইয়া জাইগোট উৎপন্ন করে। জাইগোট বহুবার বিভাজিত হইয়া স্ত্রী গাছের আগায়

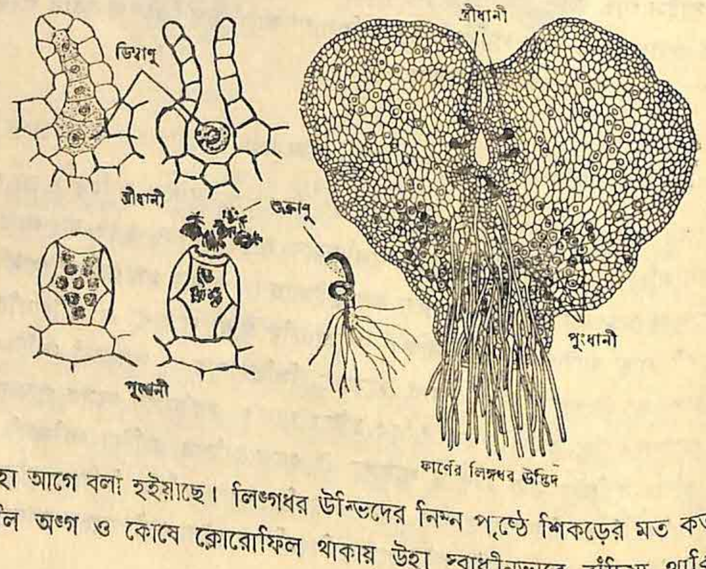
রেণুস্থলীর জন্ম দেয়। রেণুস্থলী বৃদ্ধি পাইয়া রেণু উৎপাদন করে। রেণু হইতে কিভাবে মস গাছ জন্মায় তাহা আগে বলা হইয়াছে।



পুরুষ মস গাছ পুংধানী ও স্ত্রী মস গাছ স্ত্রীধানী বহন করে

ফার্ণের যৌন জনন

ফার্ণের রেণু হইতে পান পাতার আকৃতিযুক্ত ক্ষুদ্র লিঙ্গধর উদ্ভিদ জন্মায়



ফার্ণের লিঙ্গধর উদ্ভিদ

তাহা আগে বলা হইয়াছে। লিঙ্গধর উদ্ভিদের নিম্ন পৃষ্ঠে শিকড়ের মত কতকগুলি অংগ ও কোষে ক্লোরোফিল থাকায় উহা স্বাধীনভাবে বাঁচিয়া থাকিতে

পারে। ইহা উভয় প্রকার জননেন্দ্রিয় অর্থাৎ পুংধানী ও স্ত্রীধানী বহন করে। স্ত্রীধানীগুলি উপরে খাঁজের দিকে এবং পুংধানীগুলি নীচের দিকে থাকে। মসের মত পুংধানীতে উৎপন্ন শুক্রাণু স্ত্রীধানীর ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করিলে জাইগোট উৎপন্ন হয়। ফার্ণের শুক্রাণুতে অনেকগুলি সিলিয়া থাকে। জাই-গোট বৃদ্ধি পাইয়া ফার্ণগাছে পরিণত হয়।

যৌন জননের প্রথম আভাষ পাওয়া যায় শৈবালে

ইউলোথ্রিক্স্, স্পাইরোগাইরা প্রভৃতি শৈবালের যৌন জনন পদ্ধতি খুব সরল প্রকৃতির। ইউলোথ্রিক্সের কোষের প্রোটোপ্লাজম হইতে কিভাবে চল-রেণু তৈরী হয় তাহা আগে বলা হইয়াছে। অনেক সময়ে কোষের প্রোটো-প্লাজম বহুবার বিভক্ত হইয়া ছোট ছোট চলরেণুর জন্ম দেয়। এই রেণুগুলিতে চারিটির পরিবর্তে দুইটি করিয়া সিলিয়া থাকে। আশ্চর্যের বিষয়, চলরেণুগুলি কোষের বাহিরে আসিয়া জোড়ায় জোড়ায় মিলিত হয়। ইহাদের মিলনে যে চার-সিলিয়াযুক্ত জাইগোট উৎপন্ন হয়, উহা হইতে ইউলোথ্রিক্স্ জন্মায়।



যৌন জনন

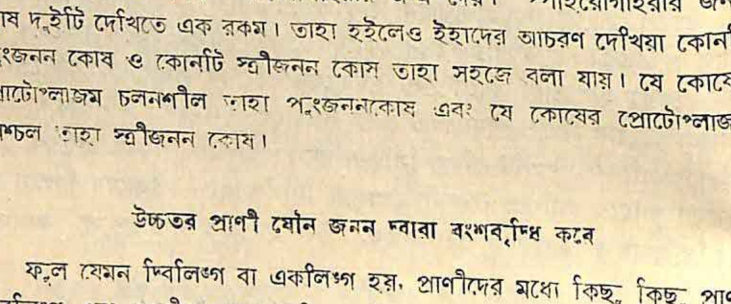
এই কারণে ছোট চলরেণুগুলিকে চলরেণু না বলিয়া জনন কোষ বলা হয়। জনন কোষগুলি একই রকম দেখিতে হয়; স্ত্রীজনন কোষ বা পুংজনন কোষ বলিয়া কিছু নাই।

স্পাইরোগাইরার সূত্রবৎ দেহ একসারী আয়তাকার কোষ দিয়ে তৈরী। জনন-

কালে দুইটি সূত্র পাশাপাশি থাকে। পাশাপাশি দুইটি কোষের কোষ-প্রাচীর একস্থানে ফুলিয়া নলের আকারে বাহির হইয়া আসে এবং (চিত্রের ন্যায়) একত্রে যুক্ত হয়। নল দুইটির মধ্যকার প্রাচীর গলিয়া যায় এবং তখন দুইটি কোষের মধ্যে একটি সংযোগ পথ তৈরী হয়। এই পথ দিয়া এক কোষের প্রোটোপ্লাজম অপর কোষে প্রবেশ করিয়া উহার প্রোটোপ্লাজমকে নিষিক্ত করে। নিষিক্ত প্রোটোপ্লাজম সঙ্কুচিত হইয়া উপবৃত্তাকার রেণুতে পরিণত হয়। কোষ বিনষ্ট হইলে রেণু বাহিরে চলিয়া আসে এবং কিছুদিন বিশ্রামের পর অনুকূল আবহাওয়ায় অঙ্কুরিত হইয়া স্পাইরোগাইরার জন্ম দেয়। স্পাইরোগাইরার জনন কোষ দুইটি দেখিতে এক রকম। তাহা হইলেও ইহাদের আচরণ দেখিয়া কোনটি পুংজনন কোষ ও কোনটি স্ত্রীজনন কোস তাহা সহজে বলা যায়। যে কোষের প্রোটোপ্লাজম চলনশীল তাহা পুংজননকোষ এবং যে কোষের প্রোটোপ্লাজম নিশ্চল তাহা স্ত্রীজনন কোষ।

উচ্চতর প্রাণী যৌন জনন দ্বারা বংশবৃদ্ধি করে

ফুল যেমন দ্বিলিঙ্গ বা একলিঙ্গ হয়, প্রাণীদের মধ্যে কিছু কিছু প্রাণী দ্বিলিঙ্গ এবং বেশীর ভাগ প্রাণী একলিঙ্গ। ফিতাকৃমি, কেঁচো কয়েকটি পতঙ্গ এবং নিম্নশ্রেণীর কয়েকটি মেরুদণ্ডী প্রাণী দ্বিলিঙ্গ। শামুক, ঝিনুক,



বিভিন্ন প্রাণীর ডিম্বাণু ও শুক্রাণু; বামদিকে ব্যাঙ ও মুরগীর ডিম্বাণু উহাদের স্বাভাবিক আয়তনের অর্ধেক করিয়া দেখান হইয়াছে। ডানদিকের শুক্রাণুগুলি বহু গুণ বিবর্ধিত।

পতঙ্গ, মাছ, ব্যাঙ, পাখী একলিঙ্গ প্রাণী। স্তন্যপায়ী প্রাণীগুলির মধ্যে যে স্ত্রী পুরুষ ভেদ আছে তাহা তোমরা জান।

দ্বিলিঙ্গ প্রাণীতে একই দেহে পুংজননেন্দ্রিয় ও স্ত্রীজননেন্দ্রিয় থাকে। একলিঙ্গ প্রাণীর ক্ষেত্রে পুরুষ প্রাণীতে পুং যৌন যন্ত্র এবং স্ত্রী প্রাণীতে স্ত্রী

যৌন যন্ত্র থাকে। পুংজননেন্দ্রিয়কে শুক্রাশয় এবং স্ত্রীজননেন্দ্রিয়কে **ডিম্বাশয়** বলা হয়। শুক্রাশয়ের মধ্যে শুক্রাণু এবং ডিম্বাশয়ের মধ্যে ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়।

মস, ফার্ণ প্রভৃতি উদ্ভিদের ন্যায় ডিম্বাণু স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের মধ্যে অবস্থান করে। একটি নিউক্লিয়াস ও কিছু প্রোটোপ্লাজম লইয়া ডিম্বাণু গঠিত। শুক্রাণুর চেহারা অন্য রকমের। ইহাতে একটি "মাথা" ও একটি "লেজ" আছে। মাথাটা প্রধানতঃ নিউক্লিয়াস এবং লেজ অংশ প্রোটোপ্লাজম দিয়া গঠিত। লেজের দ্রুত কম্পন দ্বারা শুক্রাণু সাঁতার কাটিয়া ডিম্বাণুর দিকে ধাবিত হয় এবং উহার সহিত মিলিত হইয়া জাইগোট উৎপন্ন করে। জাইগোট কোষ বিভাজন ও বৃদ্ধির দ্বারা পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয়।

যৌন জননে দুইটি জনন কোষের প্রোটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস একত্রে যুক্ত হওয়ায় নূতন প্রাণীর জীবনীশক্তি অনেক বাড়িয়া যায়। জাইগোট হইতে যে প্রাণী জন্মলাভ করে তাহা অনেক বেশী সতেজ হয়।

৬

বংশগতি

মধ্য ইউরোপের অষ্ট্রিয়ার ব্রন প্রদেশে ছিল এক সন্ন্যাসীদের মঠ। ১৮৫৬ হইতে ১৮৬৫ সালের মধ্যে যে কোন শীতের দিনে মঠের পাশ দিয়া যাতায়াত করিলে দেখা যাইত বলিষ্ঠ দেহধারী এক সন্ন্যাসীকে, যিনি ঐ মঠের কর্তা।



মঠাধ্যক্ষ মঠ সংলগ্ন বাগানে ঘুরিয়া বেড়ান, ঝুঁকিয়া পড়িয়া গাছ দেখেন, দেখা শেষ হইলে পরের গাছটিতে মনোযোগ দেন। অন্য কেহ গাছগুলি দেখিলে তাহার খুব আশ্চর্য বোধ হইত। কারণ ঐগুলি কোন দর্শনীয় ফুলের গাছ নহে; বাঁশের কঞ্চি, দড়ি দিয়া বাঁধা বাগান ভর্তি মটর গাছ। কোনটি লম্বা, কোনটি বেঁটে, কোনটির ফুল সাদা, গোলাপী বা বেগুনি, কোন মটর বীজের গা মসৃণ, কোনটির গা কর্কশ। মঠাধ্যক্ষের সংগে আলাপ করিলে বলিতেন, তিনি গ্রেগার যোহান মেন্‌ডেল। সঙ্গে সংগে বাগান দেখিবার আমন্ত্রণ জানাইতেন অতিথিকে। বলিতেন, মটর গাছগুলি তার "সন্তান", পিতৃস্নেহে এদের লালনপালন করেন। ফুল বা ফলের জন্য নহে। সন্তান-সন্ততির চেহারা কেন তার পিতামাতার মত হয়, কোন গাছ বা প্রাণীর বৈশিষ্ট্য কিভাবে তার সন্তানদের মধ্যে সঞ্চালিত হয়, তাহা দেখিবার জন্য। কারণ তিনি খুব আশ্চর্য বোধ করিতেন যখন দেখিতেন কোন পিতামাতার চোখ তামাটে রঙের কিন্তু তাদের সন্তানদের চোখের রঙ তামাটে বা নীল। আবার পিতামাতার চুল তামাটে রঙের হইলেও সন্তানদের সকলের চুল ঐ রঙের হয় না। মানুষ লইয়া পরীক্ষা করা সম্ভব নহে বলিয়া মেন্‌ডেল মটর গাছ লইয়া পরীক্ষা সুরু করেন।

মটর গাছ লইয়া পরীক্ষা চালাইতে মেন্‌ডেল নয় বৎসর অতিবাহিত করেন।

এই পরীক্ষা হইতে যে সব তথ্য আবিস্কৃত হয় তাহা আজও জীবন-বিজ্ঞানের এক অমূল্য সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হয়। তথ্যগুলি অনুধাবন করিলে বোঝা যায় কেমন করিয়া এক পুরুষের বৈশিষ্ট্য পরবর্তী পুরুষে সঞ্চালিত হয় এবং পিতা-মাতার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ নাই তাহা কিভাবে সন্তানদের মধ্যে প্রকাশিত হয়। আমাদের মধ্যে কেহ লম্বা, কেহ বেঁটে, কেহ যন্ত্রবিদ্যায় নিপুণ, কেহ সংগীতে, কেহ বা অঙ্কে। পূর্বপুরুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কিভাবে পরবর্তী পুরুষে প্রকাশ লাভ করে মেন্‌ডেলের আবিষ্কার হইতে তাহা অনেকখানি বুঝিতে পারা যায়। পূর্বপুরুষ হইতে গুণাগুণ অর্জনকে এক কথায় বলা হয় বংশগতি।

দুঃখের বিষয় মেন্‌ডেলের যুগান্তকারী আবিষ্কার সে যুগে কোন স্বীকৃতি লাভ করে নাই। মেন্‌ডেল ভারাক্রান্ত মন ও হতাশ হৃদয়ে ১৮৮৪ সালে দেহত্যাগ করেন। ১৯০০ সালের গোড়ার দিকে অস্ট্রিয়া, হল্যান্ড ও জার্মান দেশের তিনজন বিজ্ঞানী মেন্‌ডেলের কাজ অনুসরণ করিয়া পৃথকভাবে গবেষণা চালান এবং মেন্‌ডেলের আবিষ্কারের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। মেন্‌ডেলের আবিষ্কার বিজ্ঞানী মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। সেইদিন হইতে জন্মলাভ করে জীবন-বিজ্ঞানের এক নূতন শাখা—**জেনেটিক্‌স্‌** বা **জিন-বিজ্ঞান**।

বংশগত গুণাগুণ যে পদ্ধতিতে পিতামাতা হইতে সন্তানদের মধ্যে প্রবাহিত হয় তাহা অত্যন্ত জটিল। খুব সহজভাবে বুঝিতে হইলে আমাদের ফিরিয়া যাইতে হইবে মেন্‌ডেলের পরীক্ষাগুলিতে। মটর গাছ লইয়া মেন্‌ডেল যে সব পরীক্ষা চালান সেগুলি হইতে বংশগতি সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করা সহজ হইবে।

মেন্‌ডেলের পরীক্ষা

অনেকগুলি কারণে মেন্‌ডেল মটর গাছকে তার গবেষণার বস্তু হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ মটর গাছে বিভিন্ন রকমের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। গাছগুলি লম্বা অথবা বেঁটে, ফুল সাদা, গোলাপী বা বেগুনি রঙের, বীজের খোসা মসৃণ, কর্কশ বা কোঁচকান। দ্বিতীয়তঃ মটর ফুল স্বপরাগী, এক ফুলের পরাগ বা রেণু সেই ফুলের গর্ভদণ্ডে পড়িয়া গর্ভপত্রকে নিষিক্ত করে। নিষেকের জন্য অন্য মটর গাছের ফুলের উপর নির্ভর করিতে হয় না। তৃতীয়তঃ নিজের ইচ্ছামত হাতের সাহায্যে এক ফুলের রেণু দ্বারা বিপরীত গুণযুক্ত মটর ফুলের গর্ভপত্রকে নিষিক্ত করা যায়। ইহাকে বলা হয় **কৃত্রিম প্রজনন**। কৃত্রিম প্রজনন দ্বারা লাল ফুলের রেণু সাদা ফুলের গর্ভপত্রের সংগে বা লম্বা গাছের রেণু বেঁটে গাছের গর্ভপত্রের সংগে অর্থাৎ দুই বিপরীত গুণসম্পন্ন মটর গাছের মধ্যে মিলন ঘটাইবার সুবিধা আছে।

মেন্‌ডেল সর্বপ্রথম বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত মটর গাছের বীজ সংগ্রহ করিয়া

জমিতে লাগান। ইহাদের মধ্যে যে গাছগুলি প্রকৃত লম্বা বা প্রকৃত খর্ব, প্রকৃত লাল বা সাদা ফুলের অধিকারী তাহাদের বীজ সংগ্রহ করেন। এই বীজগুলি হইতে যে গাছ জন্মাইবে তাহা হইতে খাঁটি লম্বা বা বেঁটে, খাঁটি লাল বা সাদা ফুলের গাছ পাওয়া যাইবে। এই রকম বিশুদ্ধ ও বিপরীত লক্ষণের অধিকারী দুইটি মটর গাছের কৃত্রিম প্রজনন ঘটাইলে কি ফল লাভ করা যায় মেন্‌ডেল তাহা দেখিতে মনস্থ করেন।

স্বপরাগযোগ ও কৃত্রিম প্রজনন

মেন্‌ডেলের পরীক্ষা দেখিবার পূর্বে স্বপরাগযোগ ও কৃত্রিম প্রজননে কি প্রভেদ তাহা জানিয়া রাখা প্রয়োজন। স্বপরাগযোগে কোন একটি ফুলের পরাগ সেই ফুলের গর্ভদণ্ডে স্থানান্তরিত হয়। কৃত্রিম প্রজননে যে ফুলের স্ত্রী-স্তবকে বীজ উৎপাদন করা হইবে কুঁড়ি অবস্থায় উহার পুংকেশরগুলি কাটিয়া ফেলা হয়। ইহাতে স্বপরাগযোগের কোন সম্ভাবনা থাকে না। স্ত্রীস্তবক পরিপক্ব হইলে ইহার গর্ভমুণ্ডে বিপরীত লক্ষণযুক্ত ফুলের পরাগ স্থানান্তরিত করা হয়। অন্য মটর ফুলের রেণু যাহাতে ঐ গর্ভমুণ্ডে না পড়ে তাহার জন্য ফুলটিকে পাতলা কাপড় বা কাগজ দিয়া আবৃত করা হয়। ফুলের মধ্যে গর্ভাধান সম্পূর্ণ হইলে ডিম্বাশয়ের মধ্যে বীজ উৎপন্ন হয়।

মেন্‌ডেলের প্রথম পরীক্ষা

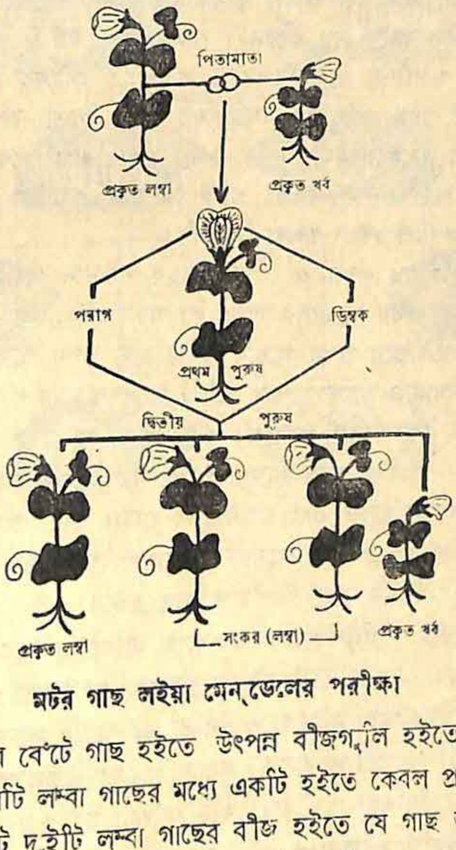
মেন্‌ডেল সর্বপ্রথম একজোড়া বৈশিষ্ট্য লইয়া কাজ সুরু করেন। একটি প্রকৃত লম্বা ও প্রকৃত খর্ব মটর গাছের মধ্যে কৃত্রিম প্রজনন ঘটান। পরীক্ষার ফল কি দাঁড়াইয়াছিল তাহা দেখা যাক।

প্রকৃত লম্বা ও প্রকৃত খর্ব মটর গাছের মধ্যে দুইভাবে কৃত্রিম প্রজনন ঘটান যায়। লম্বা গাছের পরাগ বেঁটে গাছের গর্ভমুণ্ডে অথবা বেঁটে গাছের পরাগ লম্বা গাছের গর্ভমুণ্ডে প্রয়োগ করিলে উভয় ক্ষেত্রে বীজ উৎপন্ন হইবে। পরের বছর শীতকালে বীজগুলি হইতে মটর গাছ জন্মাইবে। কি ধরণের গাছ জন্মাইবে? তোমরা কি মনে কর লম্বা ও বেঁটে গাছের সংমিশ্রণে যে বীজ উৎপন্ন হয়, উহা হইতে মাঝামাঝি উচ্চতার গাছ পাওয়া যাইবে? না তা কিন্তু নয়। প্রথম পুরুষের সব গাছ লম্বা হইবে; বেঁটে বা মাঝামাঝি উচ্চতার হইবে না।

প্রথম পুরুষের গাছগুলিকে স্বপরাগযোগ দ্বারা বীজ উৎপাদন করিতে দেওয়া হইল। গাছগুলি হইতে প্রত্যেকটি বীজ সযত্নে সংগ্রহ করিয়া পরের বছর শীতকালে জমিতে রোপণ করিলে বীজগুলি হইতে দ্বিতীয় পুরুষের গাছ পাওয়া যাইবে। দ্বিতীয় পুরুষের সব গাছ লম্বা হয় না। গণনা করিলে দেখা যাইবে মোট গাছের মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ লম্বা এবং এক-চতুর্থাংশ খর্ব। ধরা যাক মোট গাছের সংখ্যা চারটি। তাহা হইলে ইহার মধ্যে তিনটি লম্বা

গাছ ও একটি বেঁটে গাছ পাওয়া যাইবে। লম্বা ও বেঁটে গাছের অনুপাত ৩ : ১। চারটি গাছের প্রত্যেকটিকে স্বপরাগযোগ দ্বারা বীজ উৎপাদন করিতে দেওয়া হইল এবং প্রত্যেকের বীজ পৃথকভাবে সংগ্রহ করা হইল। এই বীজগুলি হইতে তৃতীয় পুরুষের গাছ পাওয়া যাইবে।

দ্বিতীয় পুরুষের চারটি গাছ হইতে আলাদাভাবে সংগ্রহ করা বীজগুলিকে পৃথক পৃথক জমিতে রোপণ করিলে এক আশ্চর্য ব্যাপার চোখে পড়িবে।



মটর গাছ লইয়া মেন্‌ডেলের পরীক্ষা

দ্বিতীয় পুরুষের বেঁটে গাছ হইতে উৎপন্ন বীজগুলি হইতে কেবল বেঁটে গাছ জন্মায়। তিনটি লম্বা গাছের মধ্যে একটি হইতে কেবল প্রকৃত লম্বা গাছ জন্মায়। অবশিষ্ট দুইটি লম্বা গাছের বীজ হইতে যে গাছ জন্মায় উহাদের তিন-চতুর্থাংশ লম্বা এবং এক-চতুর্থাংশ বেঁটে। এই অনুপাত ঠিক দ্বিতীয় পুরুষের অনুপাতের মত।

তৃতীয় পুরুষের গাছগুলি হইতে যদি চতুর্থ পুরুষের গাছ উত্তোলন করা হয় তবে দেখা যাইবে বেঁটে গাছগুলি হইতে কেবল বেঁটে গাছ জন্মলাভ করে। কতকগুলি লম্বা গাছ হইতে কেবল লম্বা গাছ জন্মায় এবং অবশিষ্ট লম্বা গাছগুলি চতুর্থ পুরুষে ৩ : ১ অনুপাতে লম্বা ও বেঁটে গাছের জন্ম দেয়।

যে বেঁটে গাছগুলি বংশানুক্রমে কেবল বেঁটে গাছের জন্ম দেয় উহাদের

বলা হয় প্রকৃত খর্ব। যে লম্বা গাছগুলি কেবল লম্বা গাছের জন্ম দেয় তাহাদের বলা হয় প্রকৃত লম্বা। কিন্তু যে লম্বা গাছগুলি পরবর্তী পুরুষে ৩ : ১ অনুপাতে লম্বা ও বেঁটে গাছের জন্ম দেয় তাহারা বিশুদ্ধ নহে। ইহাদের বলা হয় **সংকর** গাছ। দ্বিতীয় পুরুষে চারটি গাছের মধ্যে একটি প্রকৃত লম্বা, দুইটি সংকর (লম্বা) এবং একটি প্রকৃত খর্ব। বিস্তারিতভাবে লিখিলে দ্বিতীয় পুরুষের অনুপাত দাঁড়ায় ১ : ২ : ১।

উপরোক্ত পরীক্ষার মত আরও কয়েকটি পরীক্ষা চালাইয়া মেন্‌ডেল বংশগতির দুইটি সূত্র আবিষ্কার করেন। যেমন—

১। একই প্রজাতির দুই বিপরীত লক্ষণযুক্ত জীবের মধ্যে যদি প্রজনন করান হয় তবে প্রথম পুরুষের সন্তানদের মধ্যে পিতা অথবা মাতার লক্ষণ প্রকাশিত হইবে; দুইয়ের মাঝামাঝি কিছু হইবে না। যে লক্ষণটি ফুটিয়া বাহির হইবে তাহাকে বলা হইবে **প্রকট বৈশিষ্ট্য** এবং যে লক্ষণ অপ্রকাশিত থাকিবে তাহাকে বলা হইবে **প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য।**

তোমরা দেখিয়াছ লম্বা ও বেঁটে গাছের প্রজননে পরাগ যে ফুল হইতে আসুক না কেন, প্রথম পুরুষের গাছগুলি লম্বা হইয়াছিল। যেহেতু লম্বা ও বেঁটে গাছের সংমিশ্রণে প্রথম পুরুষ সৃষ্টি হয়, প্রথম পুরুষের গাছের মধ্যে দুইটি লক্ষণ বিদ্যমান আছে। তবে দুইটি লক্ষণের মধ্যে দীর্ঘতা প্রবল হওয়ায় খর্বতাকে চাপা দিয়া নিজে প্রকাশিত হইয়াছে। মেন্‌ডেল ইহার নাম দিলেন প্রকট বৈশিষ্ট্য। খর্বতা চাপা থাকায় ইহার নাম দিলেন প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য। তবে কোন বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকট এবং কোনগুলি প্রচ্ছন্ন তাহা পূর্বাহ্নে বলা যাইবে না। প্রজনন দ্বারা প্রথম পুরুষের সন্তানসন্ততি দেখিয়া কোনটি প্রকট ও কোনটি প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য তাহা নির্ণয় করিতে হইবে।

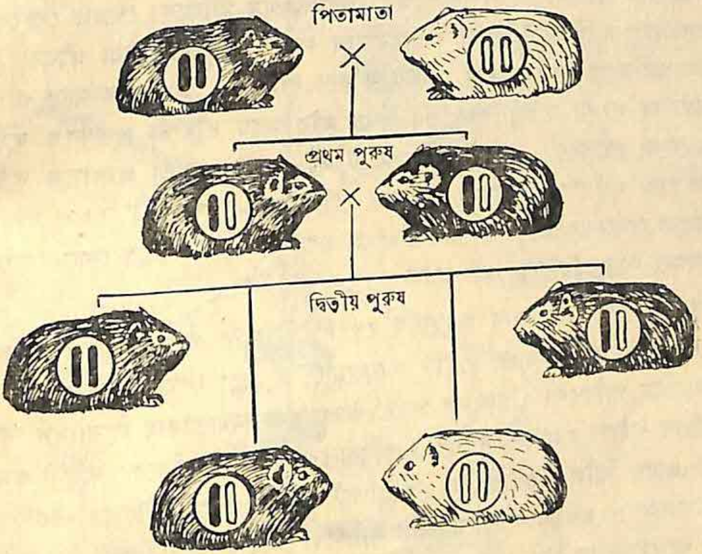
২। জীবদেহে বৈশিষ্ট্যগুলি একসঙ্গে থাকিলেও কেহ কাহারও সহিত মিশিয়া যায় না। প্রত্যেক বৈশিষ্ট্য আপন আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে।

প্রথম পুরুষের গাছে দীর্ঘতা ও খর্বতা এই দুইটি লক্ষণই বিদ্যমান থাকে। একটি প্রকাশিত অপরটি আবৃত। জননমাতৃকোষে একসঙ্গে থাকিলেও একটি অপরটির সহিত মিশিয়া যায় না। যদি মিশিয়া যাইত তবে দ্বিতীয় পুরুষে ১ : ২ : ১ অনুপাতে লম্বা ও বেঁটে গাছ পাওয়া যাইত না।

গিনিপিগ লইয়া পরীক্ষা

গিনিপিগ লইয়া অনুরূপ পরীক্ষা চালাইলে একই ফল পাওয়া যাইবে। একটি প্রকৃত কালো ও একটি প্রকৃত সাদা গিনিপিগের মধ্যে প্রজনন ঘটাইলে প্রথম পুরুষের গিনিপিগগুলির রঙ হয় কালো; ফ্যাকাশে, সাদা বা ছিট কাটা হয়। না। ইহা হইতে বুঝা যায় ইহাদের ক্ষেত্রে কালো রঙ প্রকট বৈশিষ্ট্য এবং সাদা রঙ প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য।

প্রথম পুরুষের দুইটি সংকর গিনিপিগের মধ্যে প্রজনন ঘটাইলে দ্বিতীয় পুরুষের গিনিপিগ জন্মাইবে। দ্বিতীয় পুরুষে তিন-চতুর্থাংশ গিনিপিগ কালো রঙের এবং এক-চতুর্থাংশ গিনিপিগ সাদা রঙের হয়। কালো ও সাদা গিনিপিগের অনুপাত ৩ : ১।



দ্বিতীয় পুরুষের সাদা গিনিপিগের মধ্যে প্রজনন ঘটাইলে কেবল সাদা গিনিপিগ পাওয়া যাইবে। অতএব সাদা গিনিপিগগুলিকে প্রকৃত সাদা বলা হইবে। কালো গিনিপিগগুলির মধ্যে একটি বংশানুক্রমে কেবল কালো গিনিপিগের জন্ম দেয়। ইহা প্রকৃত কালো। বাকী দুইটি কালো গিনিপিগ হইতে ৩ : ১ অনুপাতে কালো ও সাদা গিনিপিগ জন্মলাভ করে। অতএব ইহারা সংকর গিনিপিগ। ইহা হইতে বুঝা যায় বংশগতি একটা নির্দিষ্ট নিয়মে চলে।

ক্রোমোজোম মেন্‌ডেলের পরীক্ষা প্রমাণ করে

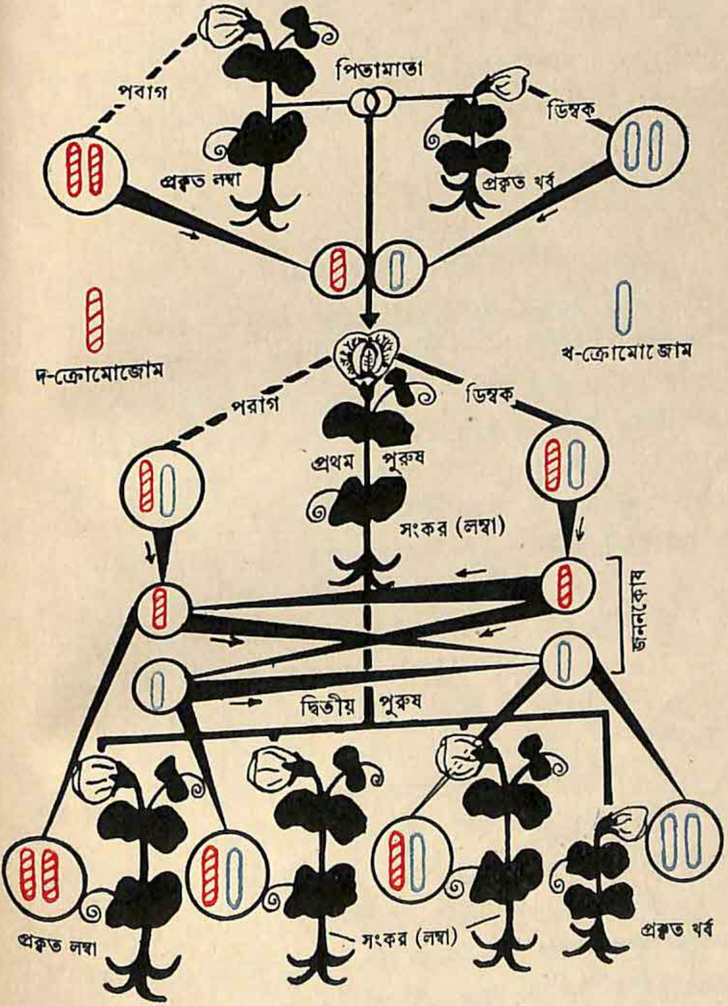
মেন্‌ডেলের পরীক্ষা যে কত নির্ভুল, বিভিন্ন পুরুষের ক্রোমোজোম পর্যবেক্ষণ করিলে তাহা সহজে বুঝা যায়। তোমরা জান উচ্চতর উদ্ভিদের দেহকোষে ও জননমাতৃকোষে দুই প্রস্থ বা দ্বিগুণ সংখ্যায় ক্রোমোজোম থাকে। জননমাতৃকোষ যখন মায়োসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়, অপত্য কোষগুলির ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হইয়া যায়। অর্থাৎ জননকোষে এক প্রস্থ ক্রোমোজোম থাকে। যৌন মিলনে দুইটি জননকোষ একত্রে মিশিলে ক্রোমোজোম সংখ্যা

পূর্বের মত দ্বিগুণ হইয়া যায়। ক্রোমোজোমগুলি বংশগত চরিত্রের ধারক ও বাহক। মটর গাছের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য যেমন, দীর্ঘতা, খর্বতা, ফুলের লাল বা সাদা রঙ ক্রোমোজোমের মধ্যে নিহিত থাকে।

ধরা যাক প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যের জন্য পৃথক পৃথক ক্রোমোজোম থাকে। তাহা হইলে দীর্ঘতা একটি ক্রোমোজোমে, খর্বতা আর একটি ক্রোমোজোমে এবং এই ভাবে অন্যান্য লক্ষণগুলি পৃথক পৃথক ক্রোমোজোমে থাকিবে। যেহেতু দেহকোষ ও জননমাতৃকোষে দুই প্রস্থ ক্রোমোজোম থাকে, উহাদের মধ্যে দীর্ঘতা বা খর্বতা লক্ষণযুক্ত ক্রোমোজোম দুইটি করিয়া থাকিবে। মনে কর মটর গাছের ক্রোমোজোম সংখ্যা দুই। অতএব লম্বা মটর গাছে দীর্ঘতা লক্ষণযুক্ত দুইটি ক্রোমোজোম থাকিবে। একইরূপে বেঁটে মটর গাছে খর্বতা লক্ষণযুক্ত দুইটি ক্রোমোজোম থাকিবে। ব্যাখ্যা করিবার সুবিধার জন্য পরবর্তী অংশে দীর্ঘতা লক্ষণযুক্ত ক্রোমোজোমকে 'দ' অক্ষর দ্বারা এবং খর্বতা লক্ষণযুক্ত ক্রোমোজোমকে 'খ' অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করা হইল।

কৃত্রিম প্রজননের জন্য সর্বপ্রথম যে দুইটি মটর গাছ লওয়া হইয়াছিল, উহাদের মধ্যে লম্বা গাছে দুইটি দ-ক্রোমোজোম এবং বেঁটে গাছে দুইটি খ-ক্রোমোজোম থাকিবে। মিলনের পূর্বে উভয়ের জননমাতৃকোষ মায়োসিস দ্বারা বিভাজিত হইলে জননকোষে একটি করিয়া ক্রোমোজোম থাকিবে। দুইটি জনন-কোষ একত্রে মিলিত হইলে যে জাইগোট উৎপন্ন হইবে উহাতে একটি দ-ক্রোমোজোম ও একটি খ-ক্রোমোজোম থাকিবে। তোমরা জান জাইগোট হইতে প্রথম পুরুষের যে গাছ জন্মায় তাহা লম্বা গাছ। দ-ক্রোমোজোম প্রবল হওয়ায় প্রথম পুরুষে দীর্ঘতা প্রকট হইয়াছে। এই গাছটি সংকর (লম্বা) গাছ তাহা ইহার ক্রোমোজোম হইতে বুঝা যায়। প্রকৃত লম্বা গাছে দ-ক্রোমোজোম দুইটি থাকে।

প্রথম পুরুষের গাছে স্বপরাগযোগ ঘটিলে ক্রোমোজোম বণ্টন কিভাবে হয় দেখা যাক। এই গাছের পরাগধানী ও ডিম্বকে জননমাতৃকোষ মায়োসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হইবে। বিভাজনের প্রথম অবস্থায় যখন ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হইবে, তখন দ-ক্রোমোজোম একটি নিউক্লিয়াসে এবং খ-ক্রোমোজোম অপর নিউক্লিয়াসে প্রবেশ করিবে। মায়োসিসের দ্বিতীয় অবস্থায় দ-ক্রোমোজোমযুক্ত নিউক্লিয়াস হইতে দুইটি এবং খ-ক্রোমোজোমযুক্ত নিউক্লিয়াস হইতে দুইটি নিউক্লিয়াস উৎপন্ন হইবে। দেখা যাইতেছে জননমাতৃকোষ বিভাজিত হইলে দুই প্রকার জননকোষ উৎপন্ন হয়। অতএব পরাগধানী এবং ডিম্বক উভয়ের মধ্যে দুই প্রকার জননকোষ সৃষ্টি হইবে। এখন পরাগধানীর যে কোন এক প্রকার জননকোষ ডিম্বকের যে কোন একটি জননকোষের সহিত মিলিত হইতে পারে। উহাদের মিলনে দ+দ, দ+খ, দ+খ এবং খ+খ—এই



পিতামাতা
পবাগ
ডিম্বক
প্রকৃত লম্বা
প্রকৃত খর্ব
দ-ক্রোমোজোম
খ-ক্রোমোজোম
পরাগ
ডিম্বক
প্রথম পুরুষ
সংকর (লম্বা)
জননকোষ
দ্বিতীয় পুরুষ
প্রকৃত লম্বা
সংকর (লম্বা)
প্রকৃত খর্ব

চারটি গাছ জন্মলাভ করিবে। ইহাদের মধ্যে দ+দ প্রকৃত লম্বা; খ+খ প্রকৃত খর্ব এবং দ+খ সংকর (লম্বা)। এইগুলি দ্বিতীয় পুরুষের গাছ।

দ্বিতীয় পুরুষের গাছ হইতে তৃতীয় পুরুষ উত্তোলন করিলে কি ফল দাঁড়াইবে? প্রকৃত লম্বা গাছে স্বপরাগযোগ ঘটাইলে উহা হইতে কেবল প্রকৃত লম্বা গাছ পাওয়া যাইবে। প্রকৃত খর্ব গাছে স্বপরাগযোগ ঘটিলে উহা হইতে কেবল প্রকৃত খর্ব গাছ পাওয়া যাইবে। কিন্তু সংকর (লম্বা) গাছে স্বপরাগ-যোগ ঘটিলে দ্বিতীয় পুরুষের গাছের মত পুনরায় একটি প্রকৃত লম্বা, দুইটি সংকর (লম্বা) ও একটি প্রকৃত খর্ব মটর গাছের জন্ম দিবে।

মেনডেলের দ্বিতীয় পরীক্ষা

প্রথম পরীক্ষায় মেনডেল একজোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য লইয়া বংশ-গতির ধারা পর্যবেক্ষণ করেন। দ্বিতীয় পরীক্ষায় তিনি দুইজোড়া বিপরীত-ধর্মী বৈশিষ্ট্য লইয়া কাজ সুরু করেন। একটি **লাল** ফুলের **লম্বা** মটর গাছ ও একটি **সাদা** ফুলের **বেঁটে** মটর গাছের মধ্যে প্রজনন ঘটান হয়। প্রথম পুরুষে যে গাছ পাওয়া গেল তাহা লম্বা এবং লাল ফুলের। অতএব দীর্ঘতা ও লাল রঙ প্রকট বৈশিষ্ট্য এবং খর্বতা ও সাদা রঙ প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য। প্রথম পুরুষের গাছে স্বপরাগযোগ ঘটিলে ইহা হইতে দ্বিতীয় পুরুষে চার প্রকার গাছ পাওয়া যায়। যেমন—

(১) লাল ফুলের লম্বা গাছ (২) সাদা ফুলের বেঁটে গাছ, (৩) লাল ফুলের বেঁটে গাছ, (৪) সাদা ফুলের লম্বা গাছ।

ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটি গাছ পিতামহ ও পিতামহীর মত এবং তৃতীয় ও চতুর্থ গাছ নূতন সৃষ্টি। ইহা দেখিয়া মেনডেল বংশগতির আর একটি সূত্র আবিষ্কার করেন। সূত্রটি নিম্নে আলোচিত হইল।

৩। জীবের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগুলি নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে তাহা আগে বলা হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, ইহারা প্রত্যেকে স্বাধীন, কেহ কাহারও উপর নির্ভর করে না। তোমরা জান প্রথম পুরুষে লাল ফুলের লম্বা গাছ হইলেও উহার মধ্যে শুভ্রতা ও খর্বতা এই দুই লক্ষণ প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে। প্রথম পুরুষে যখন জননকোষ উৎপন্ন হয় তখন চারটি বৈশিষ্ট্য ছাড়াছাড়ি হইয়া বিভিন্ন জননকোষে প্রবেশ করে। ইহার ফলে চার প্রকার জননকোষ সৃষ্টি হয়। যেমন—লাল+লম্বা, লাল+বেঁটে, সাদা+লম্বা, সাদা+বেঁটে। অর্থাৎ দীর্ঘতা লালের সহিত যাইতে পারে বা সাদার সহিত যাইতে পারে এবং খর্বতা লালের সহিত অথবা সাদার সহিত যাইতে পারে। স্বাধীনভাবে সজ্জিত হওয়ার ফলে দ্বিতীয় পুরুষে চার প্রকার গাছ জন্মলাভ করে।

মেন্‌ডেলের নিয়মের ব্যতিক্রম

মেন্‌ডেলের পরে এমন কতকগুলি ঘটনা আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহাতে মেন্‌ডেলের নিয়মের কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, সাদা ও লাল কৃষ্ণকলির কথা বলা যাইতে পারে। এই দুই গাছের প্রজনন ঘটাইলে প্রথম পুরুষে যে গাছ জন্মায় তাহার ফুলের রঙ হয় গোলাপী। দেখিলে মনে হয় লাল ও সাদা রঙ যেন মিশিয়া গিয়া গোলাপী রঙের সৃষ্টি করিয়াছে। দুধ ও আলতা একসঙ্গে মিশাইলে যেমন হয়, সেই রকম। কিন্তু প্রথম পুরুষের দুইটি গোলাপী গাছের মধ্যে প্রজনন ঘটাইলে দ্বিতীয় পুরুষে একটি প্রকৃত লাল, দুইটি গোলাপী এবং একটি প্রকৃত সাদা কৃষ্ণকলি জন্মায়। এখানেও ১ ঃ ২ ঃ ১ অনুপাতে গাছ উৎপন্ন হয়। প্রথম পুরুষে লাল ও সাদা এই লক্ষণ দুইটি যে মিশিয়া যায় নাই, দ্বিতীয় পুরুষের গাছগুলি তাহার প্রমাণ। লাল ও সাদা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছে বলিয়া দ্বিতীয় পুরুষে প্রকৃত লাল ও প্রকৃত সাদা গাছ জন্মিয়াছে।

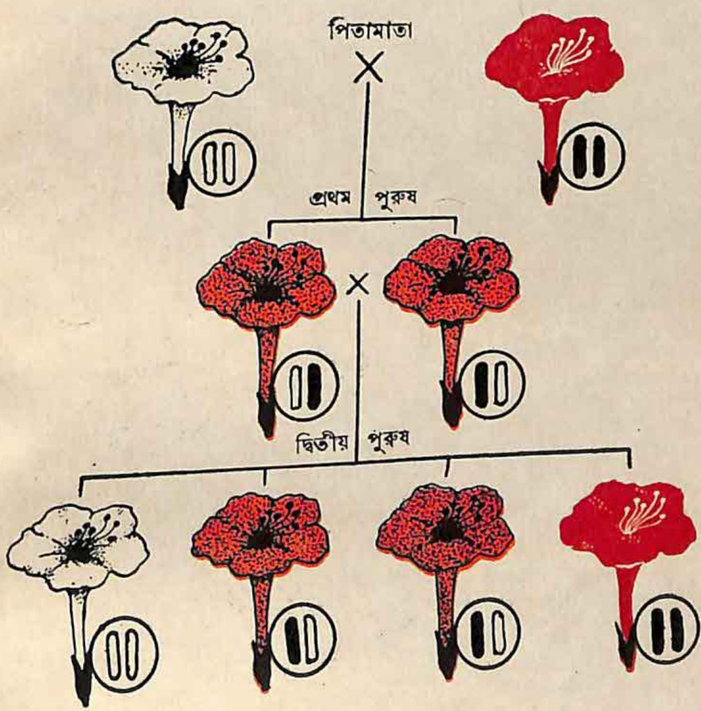
প্রথম পুরুষে গোলাপী রঙ কেমনভাবে আসিল? ইহার উত্তরে বলা যায় লাল কিংবা সাদা কেহ কাহারও উপর সম্পূর্ণভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কোন একটি বর্ণ সম্পূর্ণরূপে প্রবল হইলে প্রথম পুরুষে সেই বর্ণটি প্রকাশিত হইত। সাদা এবং লাল কোনটিই পুরাপুরি প্রকট বৈশিষ্ট্য নহে। দুইটি বর্ণের প্রভাব থাকায় ফুলটি গোলাপী হইয়াছে।

এই ধরণের বহু রকম ব্যতিক্রম মাঝে মাঝে বিজ্ঞানীদের চোখে পড়ে। সতর্কতার সঙ্গে সেগুলিকে পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। নির্ভুল প্রমাণিত হইলে জিন-বিজ্ঞানের জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়।

উপসংহার

জিন-বিজ্ঞানে মেন্‌ডেলের দান অপরিমেয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে দার্শনিক মনোভাব ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা তিনি বংশধর্ম সঞ্চালনের যে মূল সূত্রগুলি আবিষ্কার করেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পরবর্তীকালে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। তবে প্রত্যেক নিয়মের যেমন ব্যতিক্রম আছে, মেন্‌ডেলের নিয়মেও ব্যতিক্রম দেখা যায়। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে আমরা সেই কথা জানিতে পারিয়াছি।

মেন্‌ডেলের পর বহু বছর অতিবাহিত হইয়াছে। গবেষণার ফলে জিন-বিজ্ঞান আরও সমৃদ্ধ হইয়াছে। জানা গিয়াছে ক্রোমোজোমের মধ্যে জটিল জৈব রাসায়নিক পদার্থের ছোট ছোট কণা সারি-


পিতামাতা
প্রথম পুরুষ
দ্বিতীয় পুরুষ

বদ্ধভাবে সজ্জিত থাকে। কণাগুলিকে জিন নামে অভিহিত করা হয়। জিন বংশগত চরিত্র বহন করে। মটর গাছের ক্ষেত্রে দেখা যায় একটি জিন একটি বৈশিষ্ট্যের বাহক। কিন্তু জীবজগতের সর্বত্র এই কথা খাটে না। অনেক সময়ে দেখা যায়, কোন একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশের মূলে দুই জোড়া বা তার অধিক সংখ্যায় জিনের প্রভাব থাকে। আধুনিক কালে বিজ্ঞানীদের মতে জীবদেহে কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশের মূলে জিন এবং পরিবেশ উভয়েই অংশ গ্রহণ করে। জিন-গুলির মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া এবং পরিবেশের সহিত জিনের মিথষ্ক্রিয়া জীবের চরিত্র গঠন করে।

৭

জীব-অভিব্যক্তি

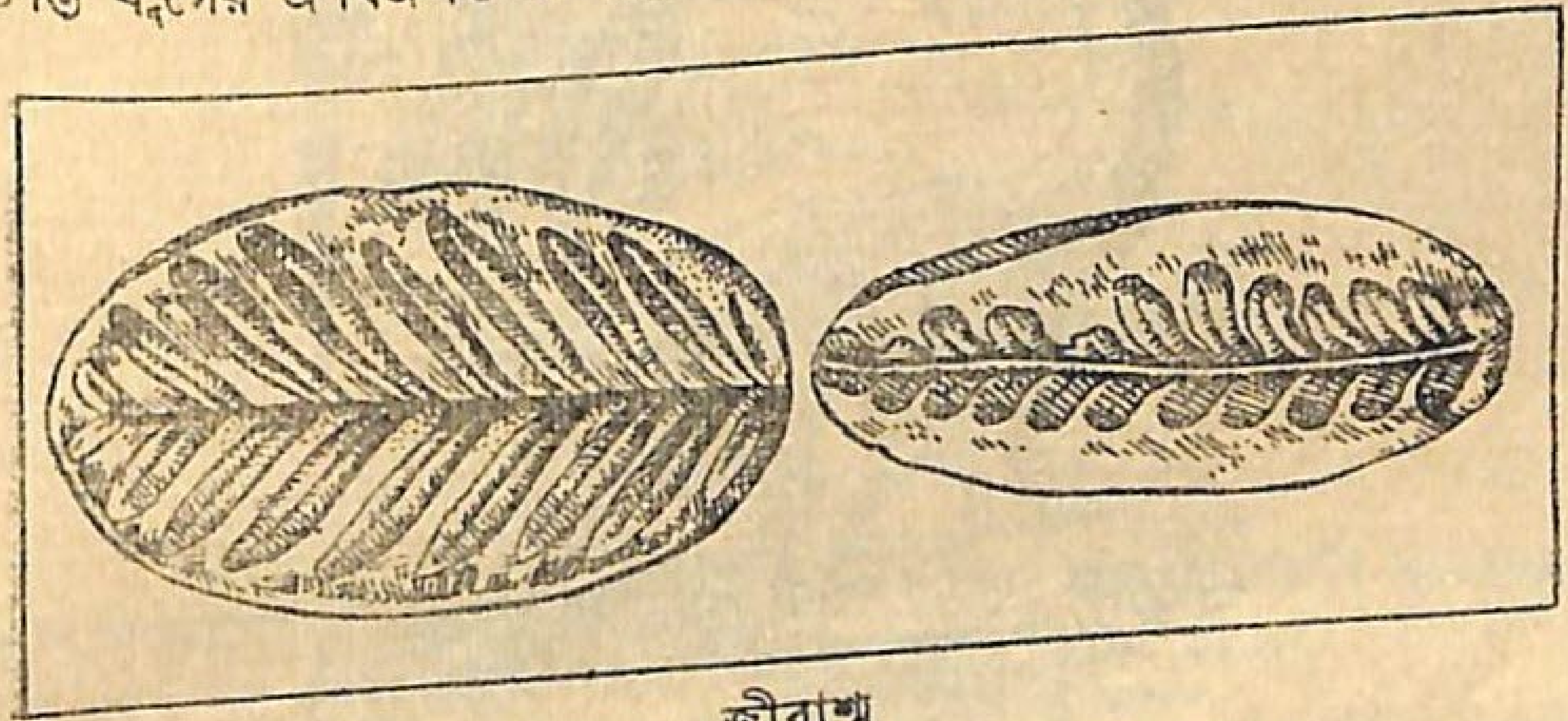
প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক জাতির যেমন একটি ইতিহাস আছে, আমাদের পৃথিবীর তেমন একটি ইতিহাস আছে। ইতিহাস আছে গাছপালার, প্রাণী-জগতের। কবে কোন আদিম যুগে সূর্য হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল গ্যাসীয় পৃথিবী। তাপ বিকিরণ করিয়া গ্যাসীয় পিন্ড পরিবর্তিত হইয়াছিল তরলে, তরল হইতে কঠিনে। পৃথিবীর বহির্ভাগে গঠিত হইয়াছিল শিলাময় ভূত্বক, জল ও বায়ুমণ্ডল। জন্মক্ষণের পৃথিবী আর আজকের পৃথিবী এক নহে। যুগ যুগ ধরিয়া পরিবর্তনের ফলে গড়িয়া উঠিয়াছে আজকের পৃথিবী। বস্তুর এই পরিবর্তনকে বলা হয় ক্রমবিকাশ বা অভিব্যক্তি। পৃথিবী জড় পদার্থ। পৃথিবীর ন্যায় অন্যান্য জড়বস্তুও পরিবর্তনশীল। জড়ের পরিবর্তনকে বলা হয় জড়-অভিব্যক্তি।

পৃথিবীর মত পরিবর্তিত হইয়াছে উদ্ভিদজগত ও প্রাণীজগত। আজকের জীবজগত এবং অতীতের জীবজগত এক নহে। এই পরিবর্তনের শত শত নজির আছে ভূত্বকের শিলাস্তরে। পৃথিবীর ভূত্বককে মনে কর এক বিরাট পুঁথি এবং শিলাস্তরগুলি এক একটি পাতা। শিলা পুঁথির পাতায় পাতায় ধরিত্রী লিখিয়া রাখিয়াছে তার 'জীবন-চরিত', জীবজগতের পরিবর্তনের ইতিহাস। শিলাপুঁথি হইতে বিজ্ঞানী আবিষ্কার করিয়াছেন আদিম যুগের উদ্ভিদ ও প্রাণী। এই পুঁথির একমাত্র ভাষা হইল জীবাশ্ম।

জীবাশ্ম কি? ভূত্বক বিভিন্ন শিলা দ্বারা গঠিত। যে শিলা অতীত যুগের উদ্ভিদ ও প্রাণীর পরিচয় বহন করে তাহাকে বলা হয় পাললিক শিলা। ভূত্বকে পালল শিলা স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকে। রেলে ভ্রমণকালে পাহাড় কাটা সুড়ঙ্গ পথের দেওয়ালে অথবা কয়লাখনির মধ্যে পালল শিলার স্তর তোমরা হয়ত দেখিয়া থাকিবে। এই শিলার উৎপত্তি নদীবাহিত পলিমাটি হইতে। নদী-স্রোত যেথায় আসিয়া মন্থর হয় সেই স্থানে পলি জমা হয়। দিনে দিনে পলির স্তর মোটা হইতে থাকে। উপরের স্তরগুলির চাপে নীচের স্তর কঠিন শিলায় পরিণত হয়। কোন স্থানে পালল শিলার স্তর দেখিয়া সেই স্থান যে অতীত-কালে জলমগ্ন ছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

নদীস্রোতে ছোট-বড় কত রকমের গাছপালা ও জীবজন্তুর মৃতদেহ বা দেহের বিচ্ছিন্ন অংশ ভাসিয়া যায় তাহা তোমরা দেখিয়াছ। নদীর গতিবেগ যেখানে কমিয়া যায়, পলির সঙ্গে সেগুলিও সঞ্চিত হইতে থাকে। যদি

ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা আক্রান্ত না হয় তবে উহাদের পচন নিবারিত হয় এবং কালক্রমে উহারা শিলার মত কঠিন হইয়া যায়। প্রস্তরীভূত জীবদেহকে জীবাশ্ম বলে। যন্ত্রের সাহায্যে জীবাশ্ম হইতে ছেদ লইয়া মাইক্রসকোপে পর্যবেক্ষণ করিলে জীবদেহের কোষগুলি অক্ষত অবস্থায় দেখা যায়। তবে কোষগুলি প্রোটোপ্লাজমের পরিবর্তে খনিজ পদার্থে পূর্ণ থাকে। শিলার মধ্যে উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড, পাতা এবং জীবজন্তুর দেহাংশের ছাপ পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। ইহাদেরও জীবাশ্ম বলিয়া গণ্য করা হয়। এই সকল জীবাশ্ম পর্যবেক্ষণ হইতে অতীত যুগের জীবজগত সম্পর্কে অনেক তথ্য জানিতে পারা গিয়াছে।



জীবাশ্ম

ভূত্বকের পালল শিলায় প্রস্তরীভূত ফার্ণের পাতার কিয়দংশ

জীবাশ্মগুলি কত প্রাচীন? বর্তমান পৃথিবীর বয়স প্রায় ৩০০ কোটি বৎসর। ভূত্বকের বিভিন্ন শিলা পরীক্ষা করিয়া তাহা জানা গিয়াছে। জীবাশ্মগুলি যে শিলাস্তরে পাওয়া যায় তাহার বয়স স্বভাবতঃই পৃথিবী অপেক্ষা কম হইবে। বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর পালল শিলার স্তরকে পাঁচটি ভূতত্ত্বীয় অধিকল্প বা যুগে ভাগ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে প্রথম যুগ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। দ্বিতীয় যুগের শিলাস্তর হইতে কিছু আদ্যপ্রাণী, শৈবাল ও সামুদ্রিক কীটের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় যুগের স্থিতিকাল প্রায় ৬০ কোটি বৎসর। এই যুগের সমাপ্তি হয় আজ হইতে প্রায় ৮০ কোটি বৎসর পূর্বে। নীচের শিলাস্তরে জলজ জীবের উপস্থিতি দেখিয়া বিজ্ঞানীরা মনে করেন পৃথিবীতে জীবনের প্রথম আবির্ভাব ঘটিয়াছিল সমুদ্রে। পৃথিবীতে কেমনভাবে জীবন সৃষ্টি হইয়াছিল সেই সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা অনেক সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। বড় হইয়া যদি এ বিষয়ে পড়াশুনা কর তবে অনেক কথা জানিতে পারিবে।

তৃতীয় যুগে ব্যাপকভাবে প্রাণের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। প্রথম দিকে আদ্যপ্রাণী, স্পঞ্জ, শামুক, জলচর সন্ধিপদ প্রাণীর প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বাতাসের অক্সিজেন গ্রহণকারী কোন প্রাণীর সন্ধান মিলে না। শৈবালের

দেহ, নিম্নশ্রেণীর মস জাতীয় গাছের দেহাবশেষ পাওয়া যায় এই স্তরে। অতএব দেখা যায় স্থলবাসী উদ্ভিদের আবির্ভাব হয় আজ হইতে ৫৩ কোটি বৎসর পূর্বে।

তৃতীয় যুগের স্থিতিকাল প্রায় ৩৫ কোটি বৎসর। যদি নীচের শিলাস্তর হইতে উপর দিকে আসা যায় তবে দেখা যাইবে জীবের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি



ডাইনোসর; সরীসৃপ যুগের বিরাটকায় প্রাণী। পাশে দাঁড় করান মানুষটা দেখে প্রাণীটি কত বড় তা বুঝে নাও।

পাইয়াছে। ফার্ণ জাতীয় গাছ, নগ্নবীজ উদ্ভিদ প্রভৃতি স্থলবাসী উদ্ভিদ একে একে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। জলচর প্রাণী স্থলে আসিতে সুরু করিয়াছে। আরও কিছুটা উপর দিকে দেখা যায় বিরাট ভূখণ্ড জুড়িয়া বড় বড় ফার্ণ জাতীয় ও নগ্নবীজ উদ্ভিদের বন। যে বনের গাছগুলি পরে কয়লায় পরিণত হইয়াছে।

মেরুদণ্ডী প্রাণীর আবির্ভাব : তৃতীয় যুগের গোড়ার দিকে মেরুদণ্ডী প্রাণীর কোন অভাব মিলে না। ইহার কিছুটা উপরে আত্মপ্রকাশ করে খুব ছোট মেরুদণ্ডী প্রাণী। এই ধরণের প্রাণী পরিবর্তিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করে মৎস্য এবং মৎস্য হইতে আসে উভচর বা প্রথম স্থলবাসী মেরুদণ্ডী প্রাণী। তৃতীয় যুগের উপর দিকে কিছু সরীসৃপের উপস্থিতি দেখিয়া মনে হয় ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে উভচর প্রাণী হইতে। ইহা হইতে বুঝা যায় বর্তমান কালের মেরুদণ্ডী প্রাণীগুলি একই পূর্বপুরুষ হইতে আসিয়াছে।

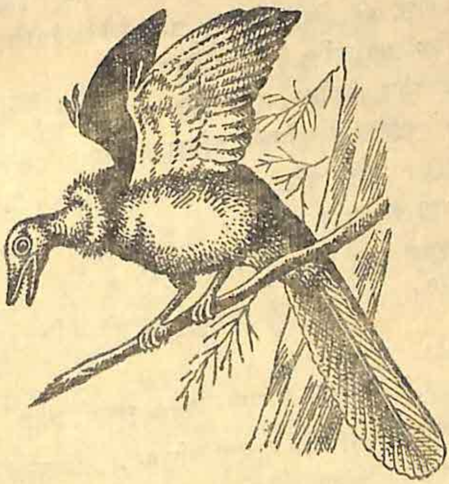
এক বিস্ময়কর ভূচাঞ্চলের মধ্য দিয়া তৃতীয় যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে। ভূপৃষ্ঠের কোন স্থান মহাসাগরের গর্ভে বিলীন হয় আবার কোন স্থান পর্বতের

আকারে উপরে উত্থিত হয়। হিমালয় পর্বতের সৃষ্টি যে এইভাবে ঘটিয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বিগত দিনের অনেক জলজ প্রাণীর দেহাবশেষ পাওয়া যায় হিমালয়ের শিলাখণ্ডে।



সরীসৃপ যুগের উড়ন্ত সরীসৃপ টেরোডাক্‌টাইল; ঘাড়, তর্জনীর প্রান্তভাগ ও পশ্চাৎপদের মধ্যে বিস্তৃত গাত্রচর্ম ইহার ডানা।

চতুর্থ যুগ সরীসৃপের যুগ। ডাইনোসর নামে বিরাটকায় সরীসৃপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল সে যুগে। ইহাদের দেহ ২৫—৩০ মিটার লম্বা এবং দেহের



আরকিয়প্‌টেরিক্স

ওজন ৩০—৪০ টন। চোয়ালের দাঁত বড় ভয়ানক। এইসব জিনিসের জীবাশ্ম পাওয়া যায় শিলাস্তরে।

চতুর্থ যুগের স্থিতিকাল প্রায় ১৯ কোটি বৎসর। এই যুগের মাঝামাঝি

পক্ষী ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে। ইহাদের উৎপত্তি যে সরীসৃপ হইতে তাহার কিছু কিছু প্রমাণ আছে। আর্কিয়প্‌টেরিক্স নাম দেওয়া এক পাখীর জীবাশ্মে সরীসৃপ ও পাখীর লক্ষণ স্পষ্ট দেখা যায়। পাখীটির পালক যুক্ত ডানা ছাড়া সরীসৃপের মত দাঁত ও লেজ আছে। ইহা দেখিয়া বিজ্ঞানীরা মনে করেন আধুনিক কালের পাখী এই জাতীয় পাখী হইতে আসিয়াছে। চতুর্থ যুগের শেষ দিকে আত্মপ্রকাশ করে আবৃতবীজ উদ্ভিদ। বর্তমানে আমরা যে উদ্ভিদ ও প্রাণী পর্বের সহিত পরিচিত, উহাদের অনেক সদস্যকে পাওয়া যায় চতুর্থ যুগের শেষ ভাগে।

পৃথিবী এখন পঞ্চম যুগে পড়িয়াছে। পঞ্চম যুগ সুরু হইয়াছে আজ হইতে প্রায় ৭ কোটি বৎসর পূর্বে। আমরা পৃথিবীর পঞ্চম যুগের প্রাণী। এই যুগে আবির্ভূত হইয়াছে বিভিন্ন প্রজাতির ফুলের গাছ এবং স্তন্যপায়ী প্রাণী।



নিঅ্যান্‌ডারথ্যাল মানব

মানুষ আসিল কবে? জীবাশ্ম হইতে জানিতে পারা যায় আদি মানুষের আবির্ভাব ঘটে আজ হইতে প্রায় দশ লক্ষ বৎসর পূর্বে। মানুষের পূর্ণ অবয়ব প্রথম আবিষ্কৃত হয় জার্মান দেশের নিঅ্যান্‌ডারথ্যাল উপত্যকা হইতে। নিঅ্যান্‌ডারথ্যাল মানবের দেহ হৃষ্টপুষ্ট, মুখমণ্ডল প্রশস্ত, চোখের উপর কপাল কার্ণিশের মত উঁচু এবং উচ্চতায় সাড়ে পাঁচ ফুট। ইহারা শিকারী এবং পাথর ঘষিয়া অস্ত্র নির্মাণের বুদ্ধি ইহাদের ছিল।

মানুষ যে হঠাৎ একদিন পৃথিবীতে আসে নাই, শিলাস্তরের জীবাশ্ম তাহার প্রমাণ। বহু যুগ অতিক্রম করিয়া আদিম মানুষ পরিবর্তিত হইয়াছে আধুনিক মানুষে। ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে সমাজ ও সভ্যতা।

ইহাকেই বলা হয় জীব-অভিব্যক্তি বা জীবের ক্রমবিকাশ। ভূত্বকের পালল শিলার স্তরে স্তরে লেখা আছে উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের ক্রমবিকাশের ধারা। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। তাই একমাত্র মানুষই বুঝিতে পারে ক্রমবিকাশের ধারাকে।

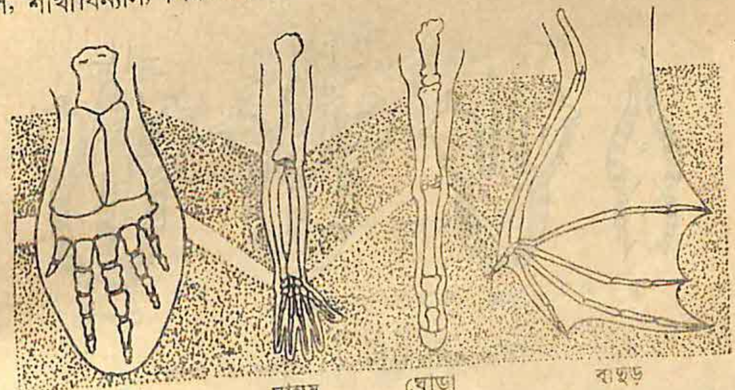
অভিব্যক্তির সপক্ষে আরও প্রমাণ আছে

এক কথায় অভিব্যক্তি বলিতে বুঝায় পরিবর্তন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোন কিছুই স্থায়ী নহে। পুরাতন হইতে জন্মলাভ করে নূতন; সরল জীব হইতে জটিল জীব। সৃষ্টিকাল হইতে এই পরিবর্তন সুরু হইয়াছে এবং যতদিন সৃষ্টি থাকিবে, এই পরিবর্তন সমানে চলিবে। এই পরিবর্তন আকস্মিক নহে বরং ধীরে ধীরে চলিতে থাকে। আমাদের ক্ষণস্থায়ী জীবনে ইহাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। আজ হইতে দশ লক্ষ বৎসর পরে বিশ্বের চেহারা কেমন হইবে তাহা

সঠিকভাবে বলা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। বিবর্তন বা ক্রমবিকাশের ধারা বিশ্বকে কোনরূপে সজ্জিত করিবে তাহা আমাদের অজানা।

জীবাশ্মগুলি যে জীব-অভিব্যক্তির একমাত্র প্রমাণ তাহা নহে। বর্তমান যুগের জীবিত উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের বহির্গঠন ও অন্তর্গঠন, ভ্রূণের বৃদ্ধিকালে বিভিন্ন অবস্থা, ভৌগোলিক বিস্তার প্রভৃতি পরোক্ষভাবে জীব-অভিব্যক্তিকে সমর্থন করে।

জীবদেহের গঠন হইতে অভিব্যক্তির প্রমাণ ঃ উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, শাখাবিন্যাস, শিরাবিন্যাস অনেক গাছে প্রায় একই রকমের হয়। আবার



বিভিন্ন প্রাণীর অগ্রপদ

তিমির অগ্রপদ, মানুষের হাত, ঘোড়ার অগ্রপদ ও বাদুড়ের ডানার আভ্যন্তরিক গঠন প্রায় এক রকম। উহাদের সকলের পূর্বপুরুষ যে এক, এই সাদৃশ্য তাহা প্রমাণ করে।

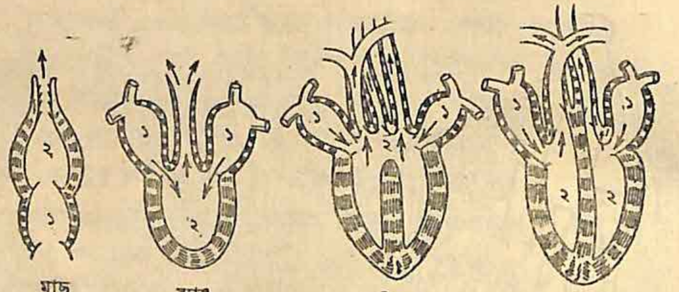
বিশেষ কার্যের নিমিত্ত ইহারা মূলগত কাণ্ড, আকর্ষ, কণ্টক, পর্ণকাণ্ড, পর্ণবৃন্ত প্রভৃতিতে রূপান্তরিত হয়। রূপান্তরিত হইলেও ইহারা সকলে একভাবে বৃদ্ধিলাভ করে। কণ্টক বা আকর্ষের চেহারা অন্যরকম হইলেও ইহারা কাক্ষিক মুকুলের স্থান হইতে উৎপন্ন হয়।

বানর গাছে গাছে ঘুরিয়া বেড়ায়, ঘোড়া দৌড়ায়, তিমি জলে সাঁতার দেয়, বাদুড় আকাশে উড়ে এবং মানুষ হাতের দ্বারা নানা প্রকার কার্য করে। এই স্তন্যপায়ী প্রাণীগুলির অগ্রপদ বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্নরূপে পরিবর্তিত হওয়ায় উহাদের দেখিতে এক রকম হয় না। কিন্তু প্রত্যেকের অগ্রপদের চামড়া ও পেশী ছাড়াইয়া হাড়গুলি পর্যবেক্ষণ করিলে এক অদ্ভুত সাদৃশ্য চোখে পড়িবে।

স্তন্যপায়ী প্রাণীর অগ্রপদের উপর দিকে একটি লম্বা হাড়, তার নীচে

একজোড়া হাড়, কব্জিতে দশটি ছোট ছোট হাড় এবং শেষে পাঁচটি আঙুল থাকে। ছবিতে দেখ, ঘোড়া এবং বাদুড়ের অগ্রপদে মধ্যের একজোড়া হাড় একত্রে যুক্ত হইয়া গিয়াছে। ঘোড়ার অগ্রপদে আঙুলের সংখ্যা কমিয়া একটিতে দাঁড়াইয়াছে। অগ্রপদগুলির মূলগত সাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয় স্তন্যপায়ী প্রাণীগুলি একই পূর্বপুরুষ হইতে আসিয়াছে।

অভিব্যক্তির ফলে কেবল যে বাহ্যিক গঠনের পরিবর্তন হয় তাহা নহে। অন্তর্গঠনেও জটিলতা বাড়ে। মৎস্য, উভচর, সরীসৃপ এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের গঠন লক্ষ্য করিলে তাহা সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। মাছের



বিভিন্ন প্রাণীর হৃৎপিণ্ড • ১ অলিন্দ • ২ নিলয়

হৃৎপিণ্ডে একটি অলিন্দ ও একটি নিলয় আছে। উভচর প্রাণীতে দুইটি অলিন্দ ও একটি নিলয় আছে। সরীসৃপে দুইটি অলিন্দ এবং একটি নিলয় আছে। কিন্তু নিলয়টি একটি অসম্পূর্ণ পর্দার দ্বারা দুই ভাগে ভাগ করা থাকে। স্তন্যপায়ী প্রাণীতে এই পর্দাটি সম্পূর্ণ হইয়া নিলয়কে দক্ষিণ ও বাম ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। স্তন্যপায়ীর হৃৎপিণ্ডে দুইটি অলিন্দ ও দুইটি নিলয় আছে। মনে হয় মৎস্য জাতীয় প্রাণীর পরিবর্তনের ফলে ক্রমে ক্রমে উভচর, সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর উৎপত্তি হইয়াছে।

ভ্রূণ হইতে অভিব্যক্তির প্রমাণ ঃ ব্যাঙাচি কিভাবে ব্যাঙে পরিণত হয় এবং মাছের ডিম মাছে পরিণত হয় তাহা তোমাদের জানা আছে। মৎস্য, উভচর, সরীসৃপ, পক্ষী ও মানুষের ভ্রূণ বৃদ্ধিকালে যে অবস্থাগুলি অতিক্রম করিয়া পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয়, সেইগুলি পাশাপাশি সাজাইয়া রাখিলে একের সঙ্গে অন্যের যথেষ্ট মিল দেখা যায়। প্রথম দিকের অবস্থাগুলি দেখিয়া উহাদের পৃথক করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীর উৎপত্তি যে মৎস্য জাতীয় প্রাণী হইতে, উপরোক্ত ভ্রূণগুলি হইতে তাহা প্রমাণিত হয়।

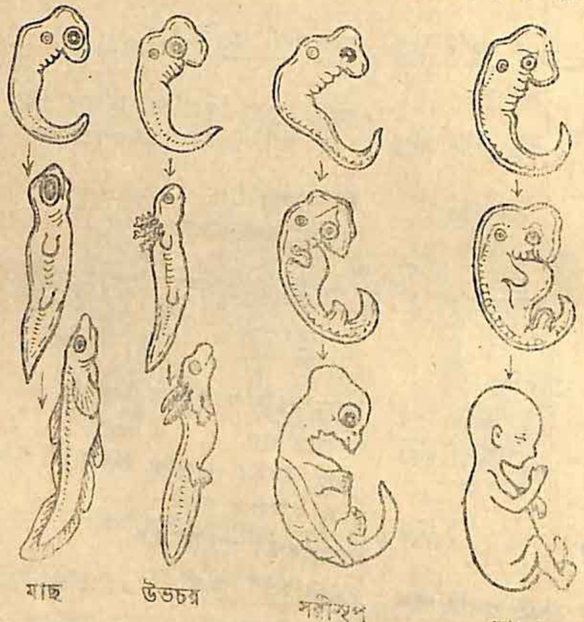
ছোলা, মটর, শিম, অপরাজিতা, কৃষ্ণকলি, মুলা প্রভৃতির বীজে একজোড়া বীজপত্র থাকে। দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদগুলি যে একই পূর্বপুরুষ হইতে

যুগ	বর্তমান হইতে কত বছর পূর্বে	কি ধরণের জীবের আবির্ভাব ঘটে
পঞ্চম যুগ	১০ লক্ষ বছর	মানুষের যুগ মানুষের আবির্ভাব
	৬ কোটি বছর	স্তন্যপায়ী প্রাণীর যুগ
চতুর্থ যুগ	২৬ কোটি বছর	ডাইনোসরের বিলুপ্তি, ফুলের গাছ, পাখী, স্তন্যপায়ী প্রাণী, আর্কিয়প্টেরিক্স সরীসৃপের যুগ পতঙ্গ, ডাইনোসরের রাজত্ব
তৃতীয় যুগ		উভচরের যুগ প্রথম সরীসৃপ, কয়লার উৎপত্তি
	৪৫ কোটি বছর	
	৫৩ কোটি বছর	মৎস্যের যুগ প্রথম উভচর ও প্রথম স্থলবাসী উদ্ভিদ, প্রথম সন্ধিপদ প্রাণী
	৮০ কোটি বছর	অমেরুদণ্ডী প্রাণীর যুগ মাছের প্রথম আবির্ভাব
দ্বিতীয় যুগ	১৪০ কোটি বছর	আদ্যপ্রাণী, শৈবাল, সামুদ্রিক কীট
প্রথম যুগ	২০০ কোটি বছর	জীবাশ্ম পাওয়া যায় নাই

শিলাস্তরে জীবাশ্মগুলি যেভাবে পর পর সজ্জিত থাকে এই ছকটি সেই ভাবে দেখান হইল। সবচেয়ে পুরাতন শিলাস্তর একেবারে নীচে এবং আধুনিক শিলাস্তর উপরদিকে রাখা হইয়াছে। এক নজরে ক্রমবিকাশের ধারাকে দেখিতে হইলে ছকটিকে নীচ হইতে উপরদিকে পড়িতে হইবে।

উৎপত্তি লাভ করিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। একবীজপত্রী উদ্ভিদগুলির ক্ষেত্রে ঠিক এই কথা বলা যায়। উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের শ্রেণীবিভাগের সময়ে যে সকল উদ্ভিদ বা প্রাণী একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তাহাদের এক শ্রেণীর মধ্যে রাখা হয়। এক বৈশিষ্টাযুক্ত উদ্ভিদ বা প্রাণী একই পূর্বপুরুষ হইতে আসিয়াছে।

নিষ্ক্রিয় অঙ্গ হইতে অভিব্যক্তির প্রমাণ ঃ অনেক সময়ে দেখা যায় নূতন পরিবেশে দেহের কোন কোন অঙ্গ অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। দেহের কোন কাজে লাগে না বলিয়া ইহাদের নিষ্ক্রিয় অঙ্গ বলা হয়। মানুষের অন্ত্রের অ্যাপেণ্ডিক্‌স, চোখের তৃতীয় পাতা, গায়ের লোম, আক্কেল দাঁত, কাণের পেশী



বিভিন্ন প্রাণীর ভ্রূণ

তিমির পশ্চাৎপদ, অজগরের পা, পাখীর ডানায় আঙ্গুলের হাড়, ধানের দ্বিতীয় বীজপত্র নিষ্ক্রিয় অঙ্গের উদাহরণ। জীবের পরিবর্তন ঘটিয়াছে নিষ্ক্রিয় অঙ্গ তাহার প্রমাণ।

মানুষের অন্ত্রের অ্যাপেণ্ডিক্‌স কোন কাজ করে না এবং ব্যাকটিরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হইলে যন্ত্রণার কারণ হয়। কিন্তু খরগোস, সজারু, গিনিপিগ প্রভৃতি তৃণভোজী প্রাণীর অ্যাপেণ্ডিক্‌স বেশ বড় এবং খাদ্যের পাচনের সহায়তা করে।

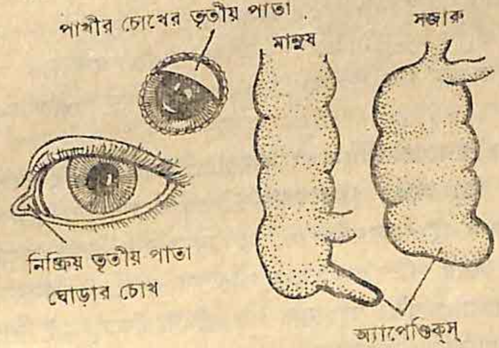
শৈত্য হইতে রক্ষা পাইবার জন্য লোমশ প্রাণীর দেহ লোমে ঢাকা। মানুষের দেহে লোমগুলি নিষ্ক্রিয় হইতে চলিয়াছে।

উভচর ও পাখীর চোখে তৃতীয় পাতা বা নিক্‌টিটেটিং মেমব্রেন আছে তাহা তোমরা জান। মানুষের বা ঘোড়ার চোখের কোণে লালচে রঙের ছোট মাংসপিণ্ডটি নিষ্ক্রিয় তৃতীয় পাতা।

খরগোস, ভেড়া, ছাগল, হরিণের কাণের পেশী খুব পুষ্ট। শব্দ শুনিবার জন্য ইহাদের বিভিন্ন দিকে কাণ ঘুরাইতে হয়। মানুষের কাণ এমনভাবে তৈরী

যে কোন দিক থেকে শব্দ আসিলে তাহা শুনিতে পায়। মানুষের কাণের পেশী থাকিলেও উহার প্রয়োজন না থাকায় নিষ্ক্রিয় হইয়া গিয়াছে।

তিমির অগ্রপদ বেশ পুষ্ট এবং সাঁতারের অঙ্গ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহার পশ্চাৎপদ আছে তবে বাহির হইতে দেখা যায় না। গায়ের মাংস ছাড়াইলে, মাংসের মধ্যে প্রোথিত দুইটি ছোট নিষ্ক্রিয় পশ্চাৎপদ দেখা যায়। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় তিমির পূর্বপুরুষের পুষ্ট ও কর্মক্ষম পশ্চাৎপদ ছিল। জলীয় পরিবেশে নিষ্প্রয়োজন হওয়ায় উহা লোপ পাইতে বসিয়াছে।



নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদেহে যে অঙ্গ পুষ্ট উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদেহে তাহা নিষ্ক্রিয়। তৃতীয় পাতা পাখীর চোখে পুষ্ট, ঘোড়া বা মানুষে নিষ্ক্রিয়। অ্যাপেণ্ডিক্স সজারুতে পুষ্ট, মানবদেহে নিষ্ক্রিয়।

দ্বিবীজপত্রী বীজে বীজপত্রে খাদ্য সঞ্চিত থাকে। একবীজপত্রী বীজে সস্যে খাদ্য জমা থাকায় পাতলা বীজপত্রটি সস্য হইতে খাদ্য লইয়া ভ্রূণকে সরবরাহ করে। দ্বিতীয় বীজপত্রের প্রয়োজন না থাকায় উহা শুষ্ক ও নিষ্ক্রিয় হইয়া গিয়াছে। একবীজপত্রী উদ্ভিদ যে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ হইতে আসিয়াছে তাহার প্রমাণ একবীজপত্রী বীজের নিষ্ক্রিয়, দ্বিতীয় বীজপত্র।

অন্যান্য সাদৃশ্য হইতে অভিব্যক্তির প্রমাণ : যে এনজাইমগুলি খাদ্য পরিপাকে অংশ গ্রহণ করে তাহা সব প্রাণীতে প্রায় একরকম হয়। যে এনজাইম দ্বারা অ্যামিবা প্রোটীন পরিপাক করে তাহা আমাদের পরিপাক যন্ত্রেও পাওয়া যায়। স্তন্যপায়ী প্রাণীগুলিতে এনজাইমগুলি ঠিক একরকমের হয়।

স্তন্যপায়ী প্রাণীর গ্রন্থি হইতে যে হরমোনগুলি নিঃসৃত হয় উহাদের প্রত্যেকের রাসায়নিক সংযুতি সবগুলি স্তন্যপায়ীতে এক রকমের হয়। ইহারা যে একই পূর্বপুরুষ হইতে আসিয়াছে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

৮

অভিযোজন

আমরা যখন কোন অচেনা জায়গায় বেড়াইতে যাই, নূতন পরিবেশে প্রথম প্রথম কিছু অসুবিধা দেখা দেয়। কিন্তু পরে সে অসুবিধা দূর হয়। প্রথম দিকে যাহা অসুবিধাজনক বলিয়া মনে হয়, পরে তাহা 'গা সওয়া' হইয়া যায়। অপরিচিত ব্যক্তির সহিত সন্তর্পণে আলাপ করি এবং তাহার মেজাজ বুঝিয়া সেইমত কার্য করি। নূতন অবস্থার মধ্যে পড়িলে নিজেকে মানাইয়া লই। পরিবেশের সংগে নিজেকে উপযোগী করার প্রক্রিয়াকে এক কথায় বলা হয় অভিযোজন।

নিজেকে পরিবেশের উপযোগী করিয়া তুলিবার ধর্ম যে কেবল মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাহা নহে। এককোষী উদ্ভিদ ও প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতর জীব সকলেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লয়। আমরা মনের পরিবর্তন দ্বারা পরিবেশ ও মনের সমন্বয় সাধন করি। উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণী, যাহাদের মন বলিয়া কিছু নাই তাহাদের মধ্যেও অভিযোজন দেখা যায়। কেবল আচরণে নহে বাহ্যিক গঠনের পরিবর্তন দ্বারা উদ্ভিদ ও প্রাণী নিজ নিজ পরিবেশে স্বচ্ছন্দে বসবাস করে।

ফরিঙের কথাই ধরা যাক। প্রাণীটির দেহে লাফাইবার উপযোগী সরু সরু পা আছে, উড়িবার জন্য ডানা আছে এবং গাছের পাতা কাটিবার জন্য শক্ত চোয়াল আছে। গায়ের রঙ অনুজ্জ্বল হওয়ায় গাছপালা ও মাটির সঙ্গে মিশিয়া যায়। বসিয়া থাকিলে দেহ নিশ্চল অবস্থায় থাকে। ফলে খুব সহজে শত্রুর চোখ এড়াইতে পারে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি থাকায় ফরিঙ স্বচ্ছন্দে জীবন কাটায়। এই অভিযোজনগুলি না থাকিলে ফরিঙের পক্ষে বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। এই-খানেই অভিযোজনের সার্থকতা।

জীবন-বিজ্ঞান পড়িতে আসিয়া যে সব উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংগে তোমাদের পরিচয় ঘটিয়াছে, লক্ষ্য করিলে তাহাদের মধ্যে কত রকমের অভিযোজন চোখে পড়িবে। যাহারা যে পরিবেশে বাস করে, পরিবেশ অনুযায়ী উহারা পরিবর্তিত হইয়া যায়। ফলে এক পরিবেশে বসবাসকারী জীব হঠাৎ যদি অন্য পরিবেশে আসিয়া পড়ে, তখন অসুবিধার সৃষ্টি হয় এবং নূতন পরিবেশের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইতে না পারিলে জীবের মৃত্যু ঘটে। যেমন, মাছকে ডাঙ্গায় তুলিয়া আনিলে বা স্থলচর প্রাণীকে জলে নামাইয়া দিলে উভয়ক্ষেত্রে জীব মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

বসবাসের জন্য প্রত্যেক উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোন না কোন রকমের বাসস্থান আছে। ব্যাঙ জলে বা জলাশয়ের কাছে বাস করে, ফড়িঙ থাকে তৃণক্ষেত্র বা চারণভূমিতে। কেঁচো মাটিতে গর্ত খুঁড়িয়া নীচে নামিয়া যায়, মাছ জলে ঘুরিয়া বেড়ায়। গাছের মধ্যে, মস স্যাঁতসেঁতে এবং ছায়াযুক্ত স্থানে বাস করে, সূর্যমুখী সূর্যকিরণে ঝলমল করে, আম গাছ ডালপালা বিস্তার করিয়া মাটিতে খাড়াভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, পদ্ম, শালুক জলের মধ্যে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটায়। যে পরিবেশে উদ্ভিদ বা প্রাণী আশ্রয় গ্রহণ করে তাহাই উহাদের বাসস্থান বা নিবাস।

অভিযোজন জীবকে পরিবেশের উপযোগী করিয়া তুলে

মাটির বুকে ঝড়-ঝাপটা উপেক্ষা করিয়া আম, বট, অশ্বত্থ, নারিকেল, শাল, সেগুন প্রভৃতি দণ্ডায়মান থাকে। ইহাদের মূলতন্ত্র শক্তভাবে মাটি আঁকড়াইয়া গাছকে দৃঢ়ভাবে মাটিতে আবদ্ধ করে। গুঁড়ি ডালপালা ও পাতার ভার বহন করে। গাছের নীচে দাঁড়াও, দেখিবে পাতার ভিড় ডালপালার আগার দিকে, নীচের দিকে পাতা প্রায় থাকে না। যেখানে থাকিলে সূর্যের আলো পাওয়া যাইবে, সেইখানে পাতার ভিড় বেশী। পাতাগুলি চ্যাপ্টা অংগ; পৃষ্ঠদেশ দিয়া অনেক বেশী সূর্যের আলো গ্রহণ করিতে পারে। শাখা-প্রশাখায় এমন-ভাবে পাতাগুলি সাজান থাকে, একটির ছায়া অপরটির উপর পড়ে না; প্রত্যেকেই সমানভাবে আলোকিত হয়। বাষ্পমোচন দ্বারা পাতাগুলি জলত্যাগ করে। পত্ররন্ধ্র বাষ্পমোচন নিয়ন্ত্রণ করে।

দুর্বলদেহী গাছগুলিও আলোর সন্ধান করে। ঘাস উন্মুক্ত স্থানে জন্মায়। বনজংগলে বড় বড় গাছ থাকায় মাটিতে সূর্যালোক পেঁছায় না। তাই সেখানে ঘাস থাকে না। মটর, শিম, অপরাজিতা, কুমড়া, উলট-চণ্ডাল, ঝুমকোলতার কাণ্ড সোজাভাবে দাঁড়াইতে পারে না। আকর্ষের দ্বারা অবলম্বনকে জড়াইয়া আলোকের দিকে বৃদ্ধি পায়। মাধবীলতার মত অনেক কাষ্ঠল লতা বনে জন্মায়। আলোকের সন্ধানে বড় বড় গুঁড়ি বেষ্টন করিয়া আগার দিকে চলিয়া যায় এবং সেখানে ডালপালা বিস্তার করে। পান, গজপিপুল মূলের দ্বারা নিজের দেহকে কোন অবলম্বনের সংগে আটকাইয়া উপর দিকে বাড়িতে থাকে।

ধান, গম, ভুট্টা বীজের অংকুরোদ্গমের সময়ে ভ্রূণমূল শীঘ্র বিনষ্ট হয়। কাণ্ডের নিম্নভাগ হইতে অস্থানিক মূল বাহির হইয়া প্রধান মূলের কার্যগুলি করিয়া থাকে।

মাটির ভিতর গর্তে অনেক প্রাণী বাস করে। কেঁচো ও সাপের দেহ বেশ সরু; সহজে গর্তে প্রবেশ করিতে পারে। ধেড়ে ইঁদুর, বেজি মাটিতে গর্ত খুঁড়িয়া উহার মধ্যে বাস করে। ইহাদের অগ্রপদ ছোট ও সুঠাম হয় এবং

মাটি খুঁড়িবার জন্য বড়, ধারাল নখর থাকে। ইহাদের কাঁধের হাড় খুব শক্ত; চোখ ও বহিঃকর্ণ খুব ছোট হয়।

অশ্ব, হরিণ, চিতা, কুকুর দ্রুতবেগে দৌড়াইতে পারে। অশ্বের দেহ দৌড়ের উপযোগী। দেহ সুঠাম, হাল্কা, অগ্র ও পশ্চাৎপদ লম্বা। গলা লম্বা এবং চক্ষু মাথার উপর দিকে থাকায় অনেক দূর পর্যন্ত দেখিতে পায়। জিরাফের গলা খুব লম্বা। বনভূমিতে 'ওয়াচ-টাওয়ারের' মত বহু দূরের জিনিস দেখিতে পায়। কেবল তাহাই নহে, মাথার খুলির উঁচু অংশে চোখ বসান থাকায় দৃষ্টি চারিদিকে প্রসারিত থাকে। জিরাফ ঘাড় না বাঁকাইয়া যে কোন দিকের জিনিস দেখিতে পায়। হাতি ধীরগতি প্রাণী। দেহের গুরুভার বহনের জন্য পাগুলি মোটা থামের মত হয়। দেহ ভারী হওয়া সত্ত্বেও হাতি কাদামাটির উপর দিয়া সহজে চলাফেরা করে। হাতি যখন কাদায় পা রাখে, পায়ের তলা বেশ থ্যাবড়া হইয়া যায়। ইহাতে কাদায় পা ডুবিয়া যায় না।

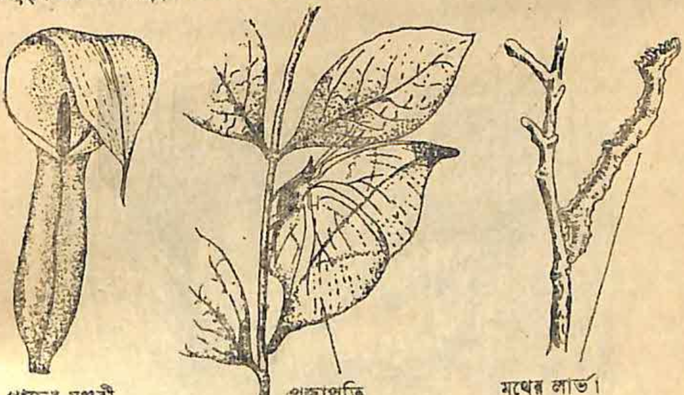
আকাশে বিচরণ করিবার জন্য প্রাণীদেহে নানাবিধ পরিবর্তন দেখা যায়। বাতাসে উড়িবার সময়ে দেহের কোন অংশ যাহাতে বাধাসৃষ্টি না করে তাহার জন্য এই পরিবর্তন ঘটে। পাখীর দেহ পরীক্ষা করিলে উড়িবার অভিযোজন-গুলি চোখে পড়িবে। পায়রা ডানার সাহায্যে উড়িয়া বেড়ায়। পালকযুক্ত ডানা দুইটি অগ্রপদের পরিবর্তিত রূপ। ইহাদের দেহ হাল্কা, চোখ বড় এবং দৃষ্টি প্রখর। বহুদূরের জিনিস স্পষ্ট দেখিতে পায়। চিল, বাজ, শকুন অনেক উঁচুতে উড়িয়া বেড়ায়। কিন্তু দূর হইতে মাটিতে পড়িয়া থাকা জীবজন্তুর মৃতদেহ দেখিতে পায়। ডানার ঝাপটায় বেশ ভালভাবে উড়িতে পারে এবং দিক পরিবর্তন করিতে পারে। ডানার ঝাপটা সহ্য করিবার জন্য বুকের হাড় বেশ মজবুত হয়।

আত্মরক্ষার অভিযোজন

অনেক জীবজন্তু স্থলবাসী গাছ বা গাছের পাতা খাইয়া জীবনধারণ করে। শত্রুর আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য উদ্ভিদ নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকে। বাগানবিলাস, বৈঁচি, দুরন্ত, বেল, বাবলা, গোলাপ, বাঘ-আঁচড়া, কুল, ফণি-মনসার গায়ে কাঁটা থাকে। খেজুর পাতার আগা সূচালো। আনারস, শিয়ালকাঁটার পাতার কিনারায় কাঁটা থাকে। কাঁটা থাকায় জীবজন্তু কাছে আসিতে ভয় পায়। বিচুটির ফল ও পাতা, আলকুশির ফল গায়ে লাগিলে কি হয় তাহা তোমরা জান। ইহাদের গায়ে সূক্ষ্ম রোম থাকে। রোমের আগা হইতে নিঃসৃত বিষাক্ত এ্যাসিড আমাদের দেহে প্রবেশ করিয়া যন্ত্রণার কারণ হয়। ভ্যারেন্ডা, চিতা প্রভৃতির গায়ে আঠাল রোম থাকে। জীবজন্তুর মুখে আঠাল পদার্থ লাগিলে উহা সহজে দূরীভূত হয় না। এই কারণে তৃণভোজী প্রাণী

উহাদের সংস্পর্শে আসে না। উচ্ছে, নিমের তিক্ত স্বাদ, তামাক, ধুতরা, কলকে, করবীর বিষাক্ত দ্রব্য, আকন্দ শিয়ালকাঁটা, টগর, মনসার তরুক্ষীর, তুলসী, জোয়া, ঘেঁটুর উগ্র গন্ধ, ওল, কচু, মানকচুর মধ্যে কেলাসিত খনিজ দ্রব্য উদ্ভিদকে জীবজন্তুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে।

কোন কোন দুর্বলদেহী উদ্ভিদ হিংস্র প্রাণীর আকৃতি অনুকরণ করিয়া আত্মরক্ষা করে। দার্জিলিঙ অঞ্চলে এক জাতের কচুগাছ জন্মায়। উহার মঞ্জরীকে দূর হইতে সাপের ফণার মত দেখায়। এইরূপ অভিযোজনকে বলা হয় অনুকৃতি। অনুকৃতি প্রাণীদের মধ্যেও দেখা যায়। সবুজ বর্ণের পতঙ্গ



হিংস্র প্রাণীর আকৃতি বা উদ্ভিদ অঙ্গের অনুকরণ করিয়া উদ্ভিদ ও ও দুর্বল প্রাণী আত্মরক্ষা করে।

বা পতঙ্গের লার্ভা গাছের সহিত মিশিয়া থাকে। এক ধরণের প্রজাপতি গাছের ডালে বসিলে শুকনো পাতার মত দেখায়। এক প্রকার মথের লার্ভা গাছের ডালে আটকাইয়া থাকিলে উহাকে গাছের ডাল বলিয়া ভ্রম হয়। পাখীর দ্বারা তাড়িত হইলে কোন কোন মথ সাপের ছদ্মবেশ ধারণ করে।

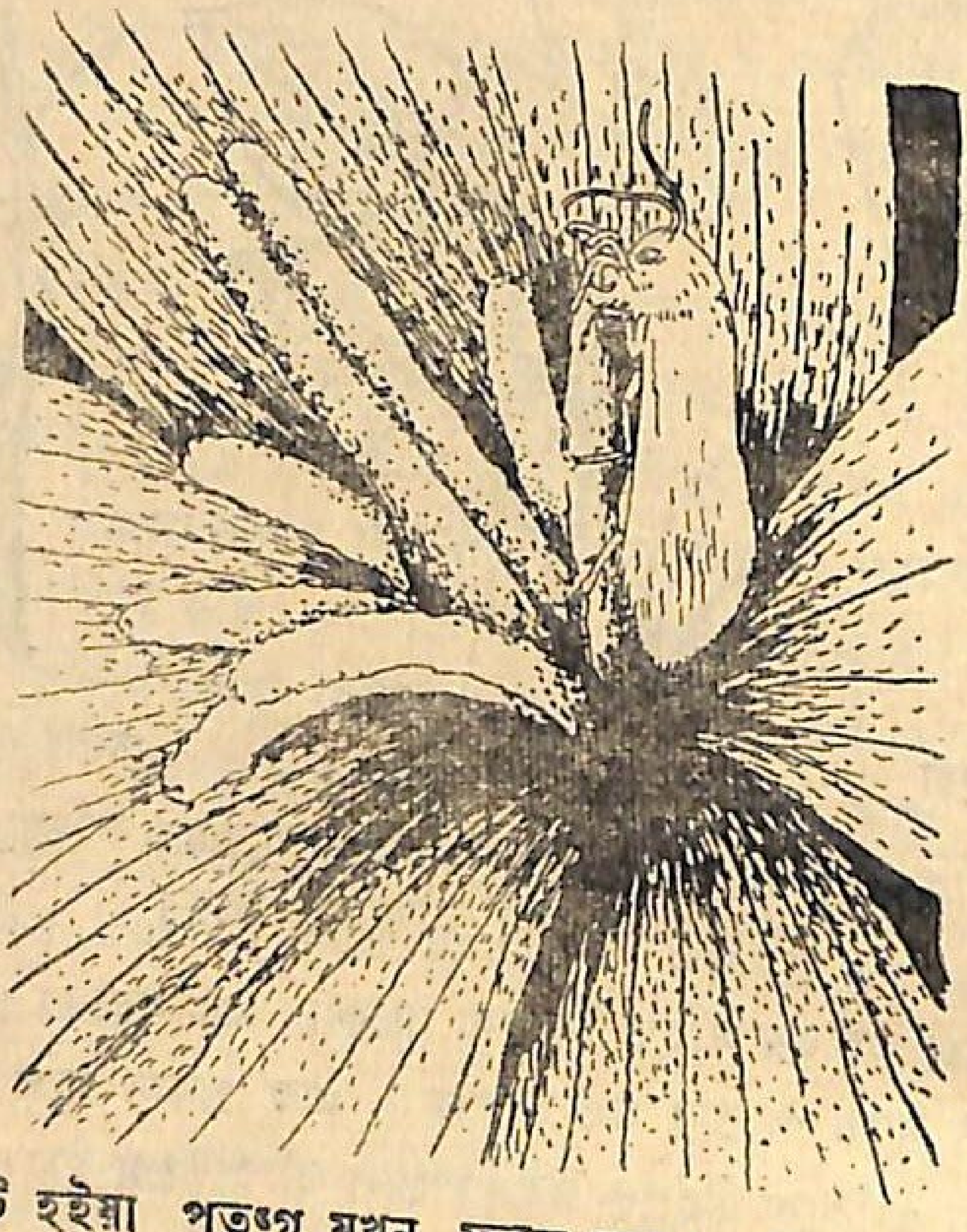
অনেক সময়ে দেখা যায় দেহের কোন অংশ আক্রান্ত হইলে প্রাণীটি জীবন বাঁচাইবার জন্য সেই অংশ পরিত্যাগ করে। জলে বিচরণকালে চিংড়ির পা যদি ধরা যায় বা কোথাও আটকাইয়া গেলে চিংড়ি উহা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। মাকড়সার ক্ষেত্রে একই ব্যাপার ঘটে। অঙ্গহানি হইলেও প্রাণীটির কোন অসুবিধা হয় না।

বর্ণ অভিযোজন

জীবজগতে বর্ণবৈচিত্র্য আছে। দেহের বর্ণকে বিভিন্ন কাজে লাগান হয়। ফুলে যে সুন্দর সুন্দর রংগুলি দেখা যায় তাহা পতঙ্গকে দূর হইতে আকর্ষণ

করে। বর্ণের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পতঙ্গ ফুলে ফুলে ভ্রমণ করিলে পরাগযোগ ঘটে। যে ফুলগুলি রাত্রে ফুটে তাহাদের রঙ সাদা হয় এবং সুগন্ধ থাকে। অন্ধকারে সাদা রঙ বেশ কার্যকরী হয়। সুগন্ধ পতঙ্গকে আকর্ষণ করে। কুঁচ বীজের গায়ের রঙ খুব সুন্দর। বর্ণে আকৃষ্ট হইয়া পাখী কুঁচের বীজ মুখে করিয়া লইয়া যায়। পরে ভুল বুঝিতে পারিয়া উহা ফেলিয়া দেয়। ইহাতে বীজের বিস্তার ঘটে।

প্রাণীজগতেও বর্ণ অভিযোজন দেখা যায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে রঙগুলি দেহের নিরাপত্তার জন্য ব্যবহৃত হয়। সামনে থাকিয়া শত্রুর চোখে ধুলা দেওয়া



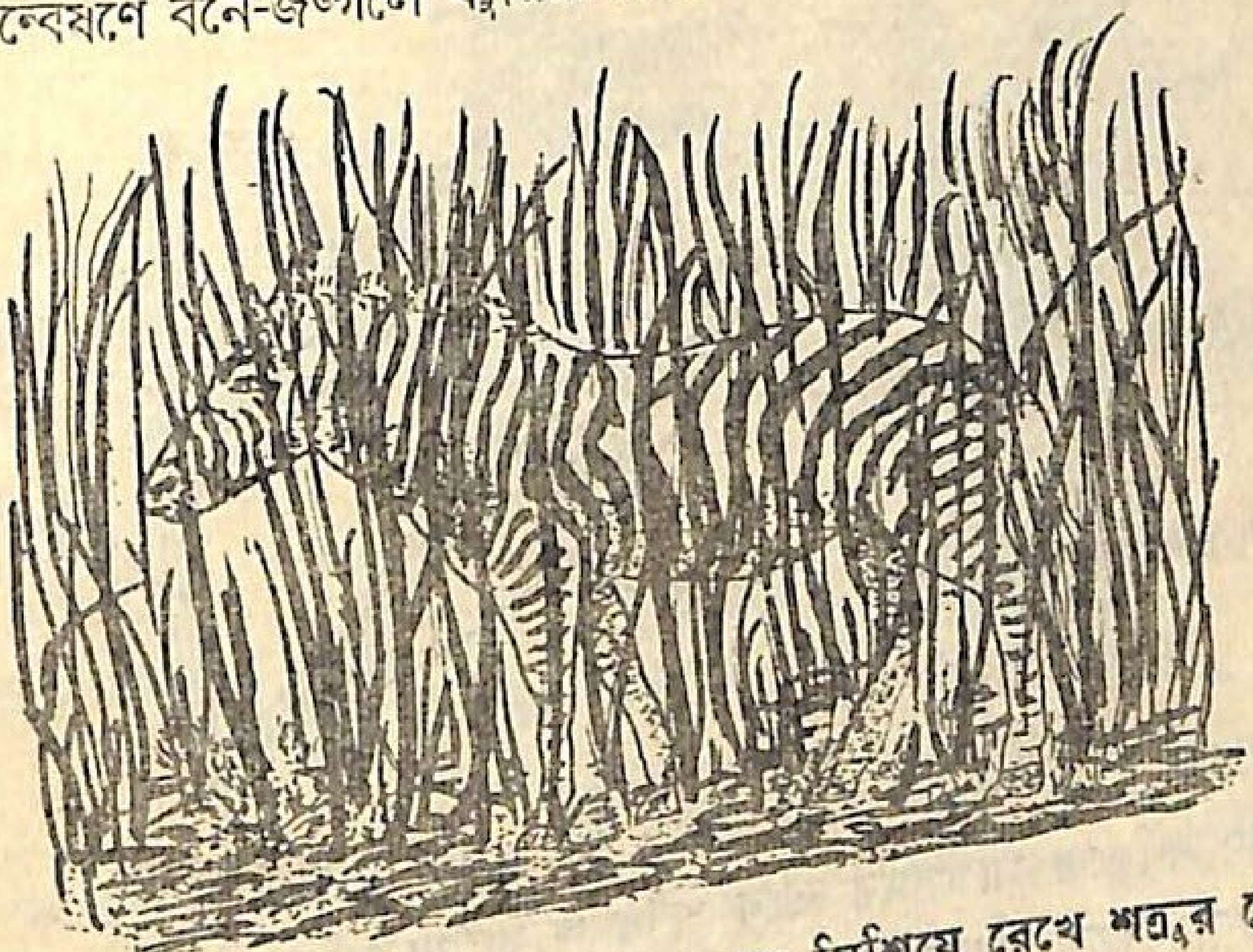
বর্ণে আকৃষ্ট হইয়া পতঙ্গ যখন ফুলে ফুলে ভ্রমণ করে তখন এক ফুলের রেণু অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হয়।

অথবা ভ্রম ঘটাইবার উদ্দেশ্যে বর্ণকে ব্যবহার করা হয়। যে প্রাণী যে পরিবেশে অবস্থান করে উহাদের দেহের রঙ অনেকটা সেই পরিবেশের মত হয়। অনেক ফড়িং বা মাকড়সা ঘাসে অথবা সবুজ গাছপালার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাদের গায়ের রঙ সবুজ। লাউডগা সাপ সবুজ বর্ণের লতা-কাণ্ডের মত দেখায়। সামনে থাকিলেও সহসা চোখে পড়ে না। গাছের গুঁড়ির গর্তে যে মাকড়সা বাস করে তাহার রঙ ধূসর বর্ণের। যে মাকড়সা ফুলে ফুলে ঘুরিয়া বেড়ায় উহার রঙ ফুলের পাপড়ির মত। তুষারাবৃত মেরু অঞ্চলে ভাল্লুকের রঙ তুষার শুভ্র। সমুদ্রের কাঁকড়ার গায়ের শক্ত আবরণ নীলবর্ণ। জেব্রার গায়ের কালো-

সাদা ডোরা, জিরাফের গায়ের ছোপ ছোপ দাগ সহজেই অরণ্যের পরিবেশের সহিত মিলাইয়া যায়।

শামুক, পতঙ্গ খুব তাড়াতাড়ি দেহের রঙ বদলাইতে পারে। পরিবেশের বর্ণ অনুযায়ী ইহাদের দেহের রঙ বদলাইয়া যায়। এক ধরণের গিরগিটি দ্রুত রঙ বদলায় বলিয়া **ইহার নাম বহুরূপী। রান্নাঘরের** দেওয়ালের কালো টিকটিকি শোবার ঘরের সাদা দেওয়ালে আসিলে কয়েকদিনের মধ্যে সাদা হইয়া যায়।

গায়ের রঙ অনেক প্রাণীকে শিকার ধরিতে সাহায্য করে। বাঘ, চিতা শিকারের অন্বেষণে বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ায়। জঙ্গলের লম্বা ঘাস বা গাছ-



ঝোপ-ঝাড়ের আলো-আঁধারে জেব্রা নিজেকে মিশিয়ে রেখে শত্রুর চোখ এড়াতে পারে।

পালার মধ্যে যেমন আলোছায়ার ডোরা সৃষ্টি হয়, বাঘের গায়ের ডোরা দাগ সহজেই উহার সহিত মিশিয়া যায় এবং ভ্রম ঘটায়। শিকারের খুব কাছে থাকিলেও চোখে পড়ে না।

সমুদ্রের অক্টোপাস বা ঐ জাতীয় প্রাণীদের দেহে থলির মধ্যে কালো রঙের জলীয় পদার্থ থাকে। আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিলে প্রাণীটি দ্রুত জলের মধ্যে উহা নিক্ষেপ করে। ইহাতে জল ঘোলা হইয়া যায় এবং শত্রু শিকারকে দেখিতে পায় না। ইত্যবসরে প্রাণীটি পলায়ন করে।

মরু উদ্ভিদের অভিযোজন

ক্যাক্‌টাস বা ফণিমনসা জাতের গাছে শৈশবাবস্থায় পাতা খসিয়া পড়ে। উহাদের কাণ্ড পাতার মত সবুজ ও চ্যাপ্‌টা হইয়া পাতার যাবতীয় কার্য করে।

শতমূলী গাছের ছোট ছোট শাখা পাতার মত চ্যাপ্টা হইয়া যায়। আকাশমণি পাতার অনুফলকগুলি ছোট অবস্থায় খসিয়া পড়ে। উহার পত্রবৃন্ত চ্যাপ্টা হইয়া পাতার কার্য করে। মরুভূমি বা শুষ্ক অঞ্চলে যে সব গাছ জন্মায়, এই অভিযোজনগুলি সেই সব গাছে দেখা যায়। শুষ্ক অঞ্চলে বাষ্পমোচনের হার অনেক বেশী এবং মাটিতে জলের পরিমাণ অনেক কম থাকে। যদি অতিরিক্ত মাত্রায় বাষ্পমোচন হয় এবং সেই তুলনায় গাছ মাটি হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণে



ফণি-মনসা



আকাশমণি

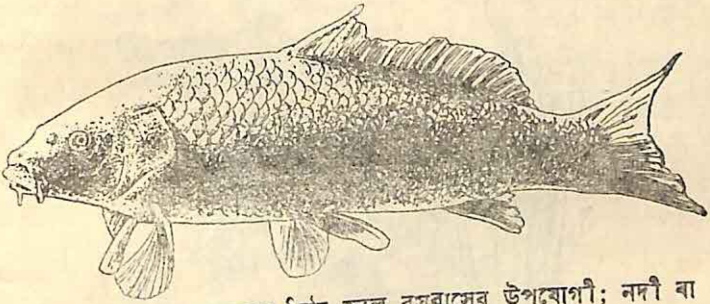
জলশোষণ করিতে না পারে তবে শীঘ্র শুকাইয়া মরিয়া যাইবে। বাষ্পমোচন বন্ধ করিবার জন্য পাতাগুলি খসিয়া পড়ে। মরু অঞ্চলের গাছে বাষ্পমোচন রোধ করিবার আরও অনেক ব্যবস্থা থাকে। ইহাদের পাতার ত্বক পুরু হয়, পাতার উভয় পৃষ্ঠে তৈলাক্ত আবরণ বা ঘন রোম থাকে। অনেকের পাতা গুটানো অবস্থায় থাকে। কাণ্ড ও পাতা জল সঞ্চয় করিয়া ঘৃতকুমারী ও পুঁই গাছের মত রসাল হয়। পান্থপাদপের পত্রবৃন্ত প্রচুর পরিমাণে জল ধরিয়া রাখে। একটি বড় ক্যাকটাস ২৫-৩০ টন জল সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে। ইহাদের লম্বা শিকড় মাটির নীচে নামিয়া জল সংগ্রহ করে।

পর্ণমোচী বৃক্ষ হইতে শীতকালে পাতা ঝরিয়া পড়ে। ইহাতে অতিরিক্ত বাষ্পমোচন বন্ধ হয় এবং পাতার কোষে সঞ্চিত বর্জ্য পদার্থ দূরীভূত হয়।

জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহে অভিযোজন

মাছের কথা ধরা যাক। মাছ জলে বাস করিতে অভ্যস্ত। অন্যান্য মাছের মত ফুলকার দ্বারা দেহে জলমিশ্রিত অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া শ্বাসকার্য চালায়।

সাঁতার দিবার জন্য দেহে পাখনা আছে। পাখনাগুলি নৌকার দাঁড়ের মত কাজ করে। ছিমছাম দেহ অবাধে জল কাটিয়া চলাফেরা করিতে পারে। রুই মাছ দ্রুত সাঁতার কাটিতে না পারিলেও সাঁতার দিবার জন্য ইহাকে কোন চেষ্টা করিতে হয় না। চক্ষু, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও পার্শ্বরেখার সাহায্যে পরিবেশকে অনুভব করিতে পারে। রুই মাছ জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী খাইয়া জীবনধারণ করে। ইহার চওড়া মুখ সহজে খাদ্য মুখে চালান করিয়া দেয় এবং দাঁতের সাহায্যে কাটিয়া খন্ড খন্ড করিয়া ফেলে।



রুই মাছের দেহ পুকুরের মিঠা জলে বসবাসের উপযোগী; নদী বা সমুদ্রের জলের পক্ষে অনুপযুক্ত।

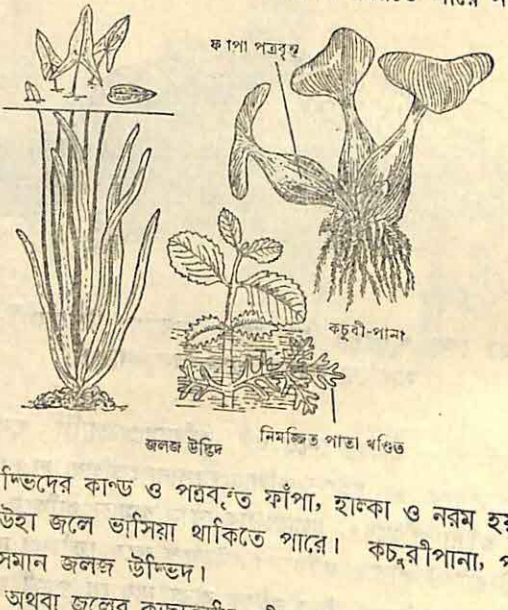
জলীয় পরিবেশে মাছের দেহে এই অভিযোজনগুলি খুবই উপযোগী। কিন্তু একবার মাছকে জল হইতে তুলিয়া ডাংগায় ফেলিয়া দাও। মাছটি একবারে অসহায় হইয়া পড়িবে। চলাফেরার কোন ক্ষমতা থাকিবে না, শ্বাস বন্ধ হইবে। মাছটি ছটফট করিতে থাকিবে। উহাকে জলে ফেলিয়া না দিলে অল্পক্ষণের মধ্যে মরিয়া যাইবে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে প্রাণী জলে ভালভাবে থাকিতে পারে অন্য পরিবেশ তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

পুকুরের জলে অক্সিজেনের অভাব ঘটিলে বা জল কমিয়া গেলে অনেক মাছ মরিয়া যায়। কিন্তু কই, মাগুর, শিংগী সহজে মরে না। ইহাদের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র থাকায় বাতাস হইতে অক্সিজেন লইয়া শ্বাস চালাইতে পারে।

শৈবাল জলে থাকে। ইহার দেহ জল হইতে খনিজ পদার্থ, অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে। সপুষ্পক জলজ উদ্ভিদ শৈবালের মত জল হইতে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি আহরণ করে। উপাদানগুলি সারা দেহ দিয়া শোষিত হয় বলিয়া ইহাদের মূলের কোন কার্য থাকে না। এই কারণে জলজ গাছের মূল খুব ছোট হয়। স্থলবাসী গাছগুলিতে মৃত্তিকা-রস কাণ্ডের জাইলেমের মধ্য দিয়া পাতায় প্রবেশ করে। জলজ গাছ সারা দেহ দিয়া জল শোষণ করে বলিয়া জাইলেম নালিকার প্রয়োজন খুব একটা থাকে না। উহাদের

কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ লইয়া মাইক্রসকোপে দেখিলে খুব কম সংখ্যায় জাইলেম নালিকা দেখিতে পাইবে।

নিমজ্জিত উদ্ভিদের পাতাগুলি সরু ফিতার মত অথবা ফলকটি খণ্ডিত থাকে। ইহাতে জলস্রোত বাধাপ্রাপ্ত হয় না। ফলক বড় ও অখণ্ডিত হইলে জলস্রোতে বাধা সৃষ্টি করিবে এবং ছিড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। নিমজ্জিত গাছগুলির পত্ররন্ধ্র থাকে না। পদ্ম, শালুক ও অন্যান্য গাছ যাহাদের পাতা জলে ভাসিয়া থাকে উহাদের পাতায় পত্ররন্ধ্র উপরপৃষ্ঠে থাকে। নিম্ন-ভাগে পত্ররন্ধ্র না থাকায় গাছের দেহে জল প্রবেশ করিতে পারে না।



জলজ উদ্ভিদ

ভাসমান উদ্ভিদের কাণ্ড ও পত্রবৃন্ত ফাঁপা, হাল্কা ও নরম হয়। ভিতরে বাতাস থাকায় উহা জলে ভাসিয়া থাকিতে পারে। কচুরীপানা, পানা, পানি-ফল, ঝাঁঝি ভাসমান জলজ উদ্ভিদ।

ব্যাঙ জলে অথবা জলের কাছাকাছি জীবনযাপনে অভ্যস্ত। ইহার অনেক-গুলি কারণ আছে। যেমন, জলে ডিম না পাড়িলে বাচ্চা বাহির হইবে না। ব্যাঙের শৈশবাবস্থা জলে অতিবাহিত হয়। ব্যাঙাচি ফুলকার দ্বারা শ্বাস চালায়। জলে না থাকিলে উহার পক্ষে বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। অতএব জলাশয়ের নিকটবর্তী স্থানগুলি ব্যাঙের বসবাসের পক্ষে উপযুক্ত।

খাদ্য গ্রহণের অভিযোজন

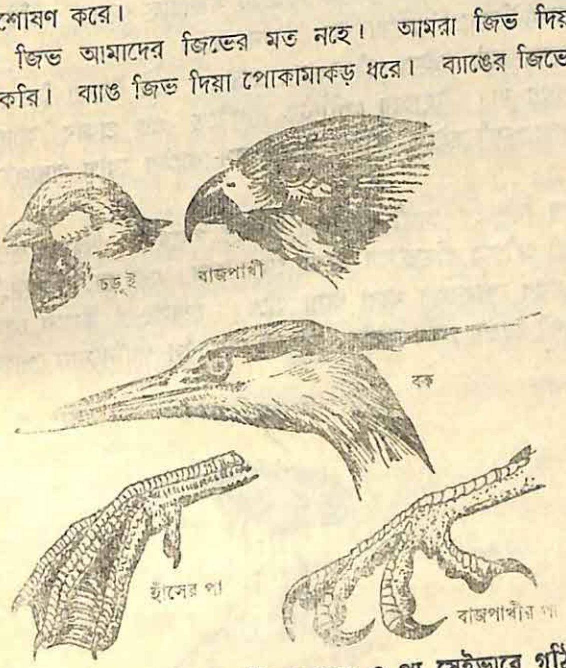
ব্যাঙের ছাতা, মিউকর জৈব পদার্থের উপর জন্মায়। স্যাঁতসেতে আব-হাওয়ায় বাঁশ, পচা কাঠ, গুঁড়ির উপর কত রকমের ছত্রাক দেখা যায়। পাউরুটির ছত্রাক মিউকর জন্মায় পাউরুটির উপর। বাহির হইতে দেখা না গেলেও ইহাদের প্রত্যেকের ছত্রাকদেহ পাউরুটি বা কাঠের মধ্যে অবস্থান করে। উচ্চতর

উদ্ভিদের মূল যেমন মাটি হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে, ছত্রাকদেহ বিস্তারলাভ করিয়া জৈব পদার্থ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে।

কলস গাছ, ড্রসেরা, পুকুরের ঝাঁঝির পাতা পোকামাকড় ধরিবার জন্য নানাভাবে রূপান্তরিত হয়। পাতাগুলি আমাদের পাকস্থলীর মত জারক রস নিক্ষেপ করিয়া শিকারের দেহ পরিপাক করে। এই অভিযোজনে উহারা সরাসরি প্রোটীন খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে।

আরশুলা কঠিন খাদ্যবস্তু গ্রহণ করে। উহার মুখের চোয়াল বেশ শক্ত হওয়ায় সহজে খাদ্যবস্তু কাটিয়া লইতে পারে। ফুল হইতে মধু সংগ্রহের জন্য প্রজাপতির মুখে লম্বা, ফাঁপা নল থাকে। মশা হুল ফুটাইয়া মানুষের দেহ হইতে রক্ত শোষণ করে।

ব্যাঙের জিভ আমাদের জিভের মত নহে। আমরা জিভ দিয়া খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করি। ব্যাঙ জিভ দিয়া পোকামাকড় ধরে। ব্যাঙের জিভের সম্মুখ



যে পাখী যেমন খাদ্য খায় উহার চঞ্চু ও পা সেইভাবে গঠিত।

প্রান্ত মুখগহ্বরে আটকান এবং পিছন প্রান্ত মুক্ত ও চটচটে। জিভকে সামনের দিকে ছুঁড়িয়া কীটপতঙ্গ ধরিয়া ফেলে।

পাখীদের মধ্যেও নানা ধরণের অভিযোজন দেখা যায়। চড়ুই পাখীর চঞ্চু ছোট এবং মোটা; ধান, গম প্রভৃতি দানা ভাঙিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। মাছরাঙা, বক তীক্ষ্ণ ও লম্বা ঠোঁট দিয়া মাছ, ব্যাঙ ধরিতে পারে। চিল, বাজ পাখীর ঠোঁট বাঁকানো থাকায় মাংস ছিঁড়িয়া খাইতে পারে। হাঁস চামচের মত ঠোঁট দিয়া কাদা মাটি খুঁচিয়া খাদ্য অন্বেষণ করে। চিল, বাজপাখী, পেঁচার

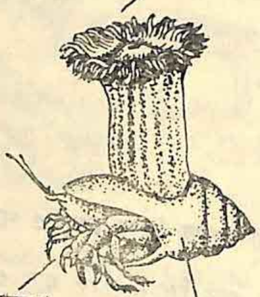
পায়ে বাঁকানো ও ধারাল নখর শিকার ধরিবার কাজে সহায়তা করে। হাঁস লিপ্তপদ দিয়া জলে সাঁতার কাটে।

নির্ভরশীলতার অভিযোজন

অনেক সময়ে উদ্ভিদ বা প্রাণী একে অন্যের উপর নির্ভর করিয়া বসবাস করে। এই নির্ভরতা সময়ে সময়ে এত গভীর হয় যে একটি জীব অপরটি ছাড়া বাঁচিতে পারে না। মটরশুটী ও অন্যান্য শিম জাতীয় গাছের সহিত নাইট্রোজেন স্থিতিকারী ব্যাকটিরিয়ার অন্যোন্যজীবীত্বের বিষয়টি তোমাদের জানা আছে। নাইট্রোজেন স্থিতিকারী ব্যাকটিরিয়া ঐসব গাছের মূলে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহারা বাতাস হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করিয়া উহাকে নাইট্রেটে পরিণত করে ও পোষক উদ্ভিদকে নাইট্রেট সরবরাহ করে। পরিবর্তে পোষক উদ্ভিদ ব্যাকটিরিয়াকে শর্করা খাদ্য প্রদান করে।

উইপোকা কাঠ খাইয়া জীবনধারণ করে। তবে ইহারা নিজে কাঠ হজম করিতে পারে না। ইহাদের পৌষ্টিক নালীতে এক প্রকার আদ্যপ্রাণী বাস করে। আদ্যপ্রাণী হইতে ক্ষরিত জারক রস কাঠের যৌগ পদার্থকে পরিপাক করে।

যে সব নিম্নতর প্রাণী চলাফেরা করিতে পারে না, উহারা কখনও কখনও বিচরণকারী জীবের বহির্ভাগে আশ্রয় গ্রহণ করে। এক ধরণের সামুদ্রিক কাঁকড়া মৃত শামুকের খোলকের মধ্যে বাসা বাঁধে। খোলকের উপরে চলনশক্তিরহিত অনেক প্রাণী আশ্রয় গ্রহণ করে। ছবিতে দেখ, সি-অ্যানিমোন খোলকটির উপর



আশ্রয় লইয়াছে। সি-অ্যানিমোনের কর্ষিকার দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয়ে অনেক ছোটখাট প্রাণী উহার কাছে আসে না। ইহাতে কাঁকড়াও অনেক বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা পায়। ইহা ছাড়া সি-অ্যানিমোন কর্ষিকার দ্বারা শিকারকে যখন চূর্ণবিচূর্ণ করে তখন কিছু কিছু খাদ্যকণা ছিটকাইয়া কাঁকড়ার ভাগ্যে

জুড়িয়া যায়। কাঁকড়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিলে সি-অ্যানিমোনের চলন ঘটে। এই অভিযোজনকে বলা হয় **পরাশ্রয়ীতা।**

পরজীবিতার অভিযোজন

খাদ্য সংগ্রহের জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে নানাবিধ ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু যাহারা পরজীবী, অন্যের দেহ হইতে তৈরী খাদ্য শোষণ করে, উহাদের দেহে খাদ্য সংগ্রহের কোন ব্যবস্থা থাকে না। তৈরী খাদ্য পাইবার ফলে ইহাদের অনেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে ও শেষে বিলুপ্ত হয়। পূর্ণ পরজীবী উদ্ভিদের মূল অপরিপুষ্ট এবং পাতা থাকে না। পরজীবী প্রাণীদের চলনের অঙ্গ, পুষ্টিতন্ত্র, চক্ষু, ঘ্রাণেন্দ্রিয় লুপ্ত হয়। এক কথায়, পরজীবিতা দেহের অবনতি ঘটায়।

বসবাসের সুবিধার জন্য পরজীবীর দেহে কিছু কিছু পরিবর্তন আসে। মানুষের অন্ত্রে যে ফিতাকৃমি বাস করে উহার দেহ, মাথা ও অসংখ্য খণ্ডিত অংশ লইয়া গঠিত। মাথার চোষকের সাহায্যে প্রাণীটি নিজেকে অন্ত্রের গায়ে আটকাইয়া রাখে। অন্ত্রের মধ্যে জল, খাদ্য, তাপ এবং আশ্রয় সব কিছু মিলে। আহার্য দ্রব্য গ্রহণ করে পোষক। পোষকের পাকস্থলী ও অন্ত্রে খাদ্যের পাচন ঘটে। ফিতাকৃমি সারা দেহ দিয়া পাচিত খাদ্য শোষণ করে। খাদ্য গ্রহণের জন্য মুখ, খাদ্য পরিপাকের জন্য পাকস্থলী বা অন্ত্রের প্রয়োজন না থাকায় ফিতাকৃমির দেহে এগুলি থাকে না। চলন ক্ষমতা, খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা অথবা আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতা ফিতাকৃমির নাই। পোষকের দেহের বাহিরে ইহা বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।

স্তন্যপায়ী প্রাণীর লোমে বা আমাদের মাথার চুল অযত্নে থাকিলে উকুন জন্মায়। উকুন পতঙ্গ শ্রেণীর প্রাণী। পরজীবীরূপে দেহের বাহিরে বাস করায় উহাকে বহিঃপরজীবী **বলা হয়।** খাদ্যবস্তু শোষণের জন্য ইহার মুখ চোষকে পরিণত হয়। তৈরী খাদ্য পাওয়ায় উড়িবার প্রয়োজন হয় না; তাই ডানা নাই।

পোষকের মৃত্যু ঘটিলে পরজীবীর মৃত্যু অনিবার্য। সেই কারণে পরজীবী প্রাণীর জনন ক্ষমতা খুব বেশী এবং যে কোন উপায়ে এক দেহ হইতে অন্য দেহে প্রবেশের চেষ্টা করে।

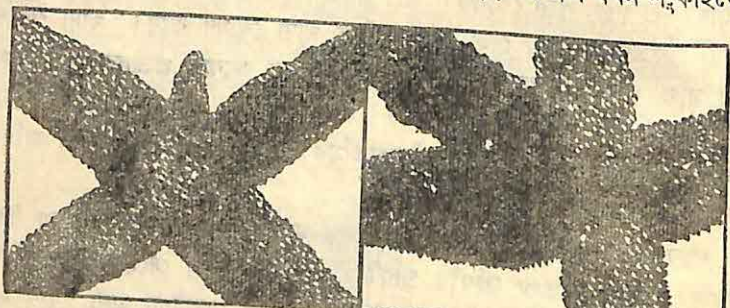
উচ্চতর উদ্ভিদের মধ্যে স্বর্ণলতা একটি পূর্ণ পরজীবী আরোহী লতা। পোষাক উদ্ভিদের দেহ আশ্রয় করিয়া বাড়িতে থাকে। ইহার দেহ হইতে চোষক মূল বাহির হইয়া পোষক উদ্ভিদের নালিকা-বাণ্ডিলের ফ্লোয়েম কলায় প্রবেশ করে এবং তৈরী খাদ্য শোষণ করে। স্বর্ণলতার রঙ হরিদ্রাভ। খাদ্য প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন না থাকায় উহার দেহে ক্লোরোফিল নাই, পাতা নাই।

পুনরুৎপত্তির অভিযোজন

নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদেহে কোন অংগ বিচ্ছিন্ন হইলে উহা পুনর্গঠিত হইতে দেখা যায়। অ্যামিবার কোষ বিভাজিত হইয়া যখন দুই অর্ধাংশে বিভক্ত হয়, প্রত্যেক অর্ধাংশ বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণাংগ অ্যামিবায় পরিণত হয়। হাইড্রা লম্বালম্বি বা অনুপ্রস্থভাবে চিড়িয়া যাইতে পারে। প্রত্যেক অর্ধাংশে যে অংগ-প্রত্যংগগুলির অভাব থাকে তাহা পুনর্গঠিত হয়। তখন প্রত্যেক অর্ধাংশ এক একটি প্রাণীতে পরিণত হয়। কেঁচোর দেহের পিছনদিক হইতে খানিকটা কাটিয়া দিলে ঐ অংশ পুনরায় গঠিত হয়। তারামাছের বাহু ভাঙিয়া গেলে ঐ স্থানে নূতন বাহু বৃদ্ধি পায়। টিকটিকির লেজে আঘাত করিলে খসিয়া পড়ে, কিন্তু রক্তপাত হয় না। কিছুদিন পর নূতন লেজ বাহির হয়।

পরিবেশের অস্থায়ী পরিবর্তনের জন্য জীব প্রস্তুত থাকে

বর্ষাকালে নানা জাতের ছত্রাক জন্মায়। ছোট ছোট গর্ত জলে ভরিয়া গেলে উহাতে দেখা দেয় কত রকমের শৈবাল। ভিজা দেওয়াল, গাছের গুঁড়ি মস ও ফার্ণ জাতীয় গাছে ভরিয়া যায়। গরমকালে পুকুরের জল যখন শুকাইতে



তারামাছের বাহু ভাঙিয়া গেলে ঐ স্থানে নূতন বাহু জন্মায়।

থাকে, অনেক জলজ গাছ মরিয়া যায়। বর্ষার আগমনে জলাশয়গুলি আবার গাছপালায় ভরিয়া উঠে। ইহা কি করিয়া সম্ভব হয়? ছত্রাক, শৈবাল, মস, ফার্ণ রেণু দ্বারা বংশবিস্তার করে। সপুষ্পক উদ্ভিদে বীজ উৎপন্ন হয়। প্রতিকূল ঋতুতে রেণু বা বীজ নিষ্ক্রিয় বা সুপ্ত অবস্থায় থাকে, মরিয়া যায় না। আবহাওয়া অনুকূল হইলে উহা অংকুরিত হইয়া নূতন উদ্ভিদে পরিণত হয়।

আদা, পিঁয়াজ, আলু প্রভৃতি মৃদগত কান্ডগুলি মাটির নীচে থাকিয়া শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে। ফুল ফুটিবার সময় আসিলে ভূনিম্নস্থ কান্ড হইতে পাতা ও ভৌম পুষ্পদণ্ড বাহির হয়। ফুলের কার্য শেষ হইলে মাটির

উপরের অংশ মরিয়া যায়, কিন্তু মাটির নীচের অংশ জীবিত থাকে। পরের বছর অনুকূল ঋতুতে পুনরায় বিটপ অংশ মাটির উপরে উঠিয়া আসে। বংশ বিস্তারের কার্য ছাড়া প্রতিকূলজীবিতা ইহাদের আর একটি কার্য। মৃদগত কান্ড গাছগুলিকে প্রতিকূল অবস্থা পার হইতে সাহায্য করে।

কেঁচো সাধারণতঃ ভিজা মাটিতে গর্তের মধ্যে বাস করে। মাটিতে গর্ত খুঁড়িয়া ইহাদের দিন কাটিয়া যায়। গর্ত খুঁড়িবার সময় ইহারা ছোট ছোট জীব সমেত মাটি খাইয়া ফেলে। রাত্রিবেলা কেঁচো খাদ্যের অন্বেষণে মাটির উপরিভাগে চলিয়া আসে। **দিনের বেলা মাটির নীচে** নামিয়া যায়। শ্বাস চালাইবার জন্য কেঁচোর দেহে ফুসফুস নাই। কেঁচো দেহের ভিজা চামড়া দিয়া শ্বাস লয়। বাতাসের অক্সিজেন ব্যাপন দ্বারা দেহচর্মের রক্তে মিশ্রিত হয়।

গ্রীষ্মকালে প্রখর রৌদ্রে মাটি যখন শুকাইয়া যায়, কেঁচো ভিজা মাটির সন্ধানে আরও নীচে নামিয়া যায়। দেহচর্ম শুকাইয়া গেলে মৃত্যু অনিবার্য এই বোধ না থাকিলেও অবস্থা অনুসারে প্রাণীটি কার্য করে। বর্ষাকালে গর্ত জলে ভরিয়া গেলে কেঁচো দিনের বেলাতেও উপরে উঠিয়া আসে ও নিজেকে ডুবিয়া যাইবার হাত হইতে রক্ষা করে! পরিবেশের অস্থায়ী পরিবর্তনের সঙ্গে প্রাণীটির আচরণের সমন্বয় লক্ষ্য করিবার মত।

ব্যাঙ জলে বা জলাশয়ের কাছাকাছি স্থানে বাস করে। ব্যাঙ ফুসফুস ও ভিজা গাত্রচর্মের দ্বারা শ্বাস লয়। শীতকাল আসিলে ব্যাঙ জলাশয়ের তল-দেশের মাটিতে গর্ত খুঁড়িয়া উহার মধ্যে অবস্থান করে। ঠান্ডা আবহাওয়ায় ইহারা সক্রিয়ভাবে জীবন যাপন করিতে পারে না; গর্তের মধ্যে নিদ্রিত অবস্থায় থাকে। ইহাকে ব্যাঙের শীতঘুম বলে। শীতঘুমের সময়ে দেহচর্ম শ্বাসকার্যে অংশ গ্রহণ করে। দেহের মজুত চর্বি ও শর্করা প্রয়োজনীয় শক্তি যোগায়।

যে সব মাছ সমুদ্রের লোণা জলে বাস করে পরিস্রুত জল তাহাদের বস-বাসের উপযোগী নহে। কোন কোন মাছ লোণা জলে ও পরিস্রুত জলে সমান-ভাবে নিজেকে মানাইয়া লইতে পারে। ইলিশ মাছ নদীর মোহানায় লবণাক্ত জলে বাস করে। বর্ষাকালে ডিম পাড়িবার জন্য নদীর অনেকখানি ভিতরে চলিয়া আসে। এই সময়ে মাছগুলির দেহে তৈল মজুত করা থাকে। নদীর জলে মাছগুলি কোন খাদ্য গ্রহণ করে না। ডিম পাড়িয়া ফিরিয়া যাইবার সময়ে বেশ রোগা হইয়া যায়। এক পরিবেশ হইতে অন্য পরিবেশে আসিয়া উহারা নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে।

অনেক পাখী অতিরিক্ত ঠান্ডা পরিবেশে বাস করিতে পারে না। উহারা ঠান্ডা জায়গা ছাড়িয়া অপেক্ষাকৃত উষ্ণ আবহাওয়ায় চলিয়া আসে। ঠান্ডা কমিলে উহারা স্বস্থানে ফিরিয়া যায়। প্রতি বছর শীতকালে কলিকাতার চিড়িয়াখানার অসংখ্য জলচর পাখী আসিতে দেখা যায়। শীতকালে চিড়িয়াখানার ঝিলে

ইহাদের দেখিতে পাইবে। এই পরিযায়ী পাখীগুলির আসল নিবাস সাইবেরিয়ায়। শীতকালে সাইবেরিয়া যখন বরফে আচ্ছন্ন থাকে, খাদ্যের জন্য ইহারা দেশান্তরী হয় এবং ভারত ও অন্যান্য স্থানে চলিয়া আসে। চিড়িয়াখানায় থাকাকালীন ইহারা ডিম পাড়ে এবং শীত কমিয়া গেলে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে; ডিমগুলি এখানে পড়িয়া থাকে। কিছুকাল পরে ডিমগুলি হইতে বাচ্চা বাহির হয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, বাচ্চাগুলি বড় হইয়া সাইবেরিয়াতে ফিরিয়া যায়। ইহারা পথের নিশানা কিভাবে স্থির করে তাহা আজও আমাদের অজানা।

গ্রীষ্মকালে রৌদ্রে চলাফেরা করিলে আমাদের গায়ের চামড়া কালো হইয়া যায়। সূর্যালোক গায়ে পড়িলে দেহচর্মে মেলানিন নামে এক রঞ্জক পদার্থ উৎপন্ন হয়। মেলানিন থাকায় আমাদের চুলের রঙ কালো হয়। চামড়ায় মেলানিন উৎপন্ন হইলে দেহচর্ম কালো হয়। মেলানিন অনেকটা পর্দার মত কার্য করে। ইহা সূর্যরশ্মির অনেকখানি শোষণ করিয়া দেহচর্মের কলাগুলিকে দগ্ধ হইবার সম্ভাবনা হইতে রক্ষা করে।

পাইন জাতের গাছ স্থানবিশেষে বিভিন্নভাবে বৃদ্ধি পায়। সুরক্ষিত উদ্যানে গাছগুলি মাটিতে খাড়াভাবে দাঁড়াইয়া চারিদিকে ডালপালা বিস্তার করে। একই গাছ ঝটিকাবিধ্বস্ত পাহাড়ী অঞ্চলে জন্মাইলে উহার গুঁড়ি খুব ছোট হয় অথবা গুঁড়ি বলিয়া কিছু থাকে না। শাখা-প্রশাখাগুলি ভূমি সংলগ্ন হইয়া বাড়িতে থাকে।

অভিযোজন ও অভিব্যক্তির সম্পর্ক

অভিযোজনের সহিত অভিব্যক্তির একটা নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে। পরিবেশ পরিবর্তনের সংগে সংগে জীবদেহ নিজেকে নূতন অবস্থার সংগে খাপ খাওয়াইয়া লইতে চায়। ইহাতে দেহের ভিতরে ও বাহিরে যে নূতন নূতন বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠে তাহাই অভিযোজন। অভিযোজনের ফলে পূর্বেকার বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয় এবং নূতন বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ঘটে। এইভাবে নূতন নূতন প্রজাতির সৃষ্টি হয়। জীবজগতে ক্রমবিকাশের মূলে রহিয়াছে অভিযোজন।

৯

জীব সমাজ ও পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক

মানুষ সম্মিলিত হইয়া একত্রে বাস করে। ইহাকেই বলা হয় লোকসমাজ। এক একটি মানুষ সমাজের খণ্ডাংশ মাত্র। সমাজের প্রত্যেক মানুষ কিছু না কিছু কার্য করে। কেহ চাষ করে, কেহ কল-কারখানায় কাজ করে। অনেকে খনি, বন্দর বা শিল্পকেন্দ্রের অধীনে নিযুক্ত। কেহ গাড়ী চালায়, সহর পরিষ্কার রাখে, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ অব্যাহত রাখে বা গৃহ নির্মাণ করে। সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় সমাজজীবন অবাধ গতিতে চলিতে থাকে।

সমাজের চেহারা সর্বক্ষেত্রে এক নহে। গ্রামের সমাজ, সহরের সমাজ এবং পার্বত্য অঞ্চলের সমাজ ভিন্ন প্রকৃতির হয়। কিন্তু যে কোন একটি সমাজ স্বয়ং-সম্পূর্ণ। ব্যক্তি-মানবের চাকায় ভর দিয়া সমাজ-রথ অগ্রসর হয়।

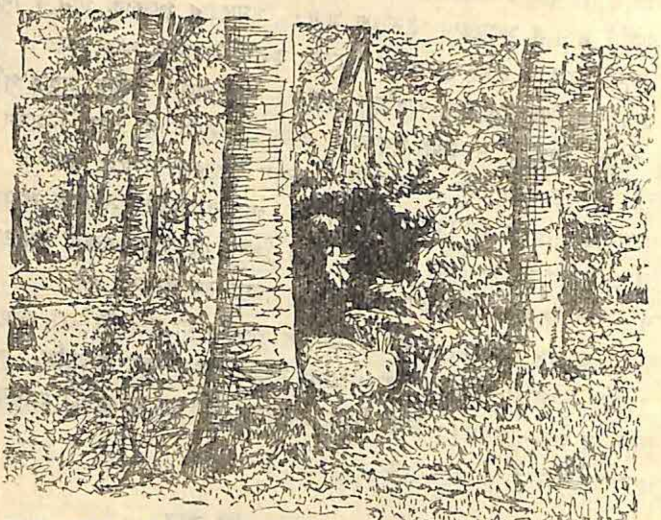
মানুষের মত অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রকৃতি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দলে দলে সমাজ সংগঠন করে। এই ধরণের সমাজ দেখা যায় তৃণভূমি, বনাঞ্চল, জলাভূমি বা মরুঅঞ্চলে। নিজ নিজ এলাকায় উদ্ভিদ ও প্রাণী সংঘবদ্ধভাবে জীবনযাপন করে।

সজীব বস্তু সমাজ গঠন করে

বনভূমি নানা জাতের উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবাসস্থল। ইহাদের মধ্যে আছে বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ, লতা, বীরুৎ ও গুল্ম। ইহা ছাড়া আছে মস, ফার্ণ ও মৃত্তিকা সংলগ্ন কত রকমের ছোট ছোট উদ্ভিদ। প্রাণীদের মধ্যে আছে কাঠ-বিড়ালী, খরগোস, ইঁদুর, পাখী, পতঙ্গ ও স্থলচর শামুক। পচা পাতা ও মৃত্তিকার মধ্যে বাস করে অসংখ্য জীবাণু। এক একটি ব্যক্তি-মানব লইয়া যেমন গঠিত হয় বৃহত্তর সমাজ, বনভূমির মধ্যে ইহারাও একাত্ম হইয়া গঠন করে সংঘ-বদ্ধ সমাজ। জলাভূমি বা তৃণভূমিতে বসবাসকারী সজীবের ক্ষেত্রে এই এক জিনিস দেখিতে পাওয়া যায়।

হিমালয়ের উচ্চ অংশে পাইন জাতের গাছের সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি, হিমালয় ও আসামের পার্বত্য অঞ্চলে শাল, সেগুণের চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি, ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে ছোট ছোট কাঁটা ঝোপের গুল্মভূমি এবং বঙ্গোপসাগরের উপকূলে সুন্দরী, গরানের বনভূমির কথা তোমরা ভূগোলে পড়িয়া থাকিবে। কোন বনভূমিতে প্রধান উদ্ভিদগুলি ব্যতীত অন্যগুলি অপাংক্তেয় এ কথা বলা যায় না। কারণ প্রকৃতির সমাজ মানব-সমাজ অপেক্ষা অনেক বেশী সংঘবদ্ধ।

যে কোন বনভূমি অথবা ছোট কুঞ্জবনের বাসিন্দাদের পরীক্ষা করিলে উহাদের সংঘবদ্ধতা সহজেই চোখে পড়িবে। বনের মধ্যে প্রধান উদ্ভিদ বৃক্ষরাজি। বড় গাছের ছায়ায় অনেক উদ্ভিদ বসবাস করে। যে সকল গুল্ম-জাতীয় উদ্ভিদ ও ফার্ণ আলোকিত স্থান পছন্দ করে না তাহারা বৃক্ষরাজির ছায়ায় আশ্রয় লয়। বৃক্ষগুলির কোটরে আশ্রয় গ্রহণ করে কাঠবিড়ালী, বাদুড়



বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, বীরুৎ এবং ইহাদের সঙ্গে বসবাসকারী ছোট, বড় কত রকমের প্রাণী নিয়ে তৈরী হয়েছে বনভূমির জীবসমাজ।

ও কাঠঠোকরা। শাখা-প্রশাখায় কত রকমের পাখী বাসা তৈরী করে; মৌমাছি, ভীমরুল চাক বাঁধে। পুরানো গুঁড়িতে সুড়ংগ কাটে পতঙ্গের লার্ভা। ঝরা পাতায় আচ্ছাদিত মাটির বুকে পোকামাকড়, শামুক, বিছা, কেন্নো পরম সুখে দিন কাটায়। এক কথায়, বনের বৃক্ষগুলি ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী সকল জীবের সুখসমৃদ্ধির প্রধান কারণ। ইহার অর্থ এই নহে যে, অপর উদ্ভিদ ও প্রাণী-গুলি পরস্পরের বা বৃক্ষগুলির কোন উপকারে আসে না। শ্রমিক, বিক্রেতা, ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক, চিকিৎসক, ইঞ্জিনীয়ার ও গৃহকর্ত্রীর সম্মিলিত শক্তিতে যেমন মনুষ্যসমাজ চলে, তেমনি ছোট-বড় সকল জীবের উপর নির্ভর করে বন-ভূমির সমাজ। বনভূমির এই সমাজে কে কতটুকু অংশ গ্রহণ করে তাহা দেখা যাক।

মহীরুহের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে **ফার্ণ ও অন্যান্য গুল্মজাতীয় গাছ।** গুল্ম উদ্ভিদের ঝোপেঝাড়ে বাস করে পাখী, ইঁদুর, বিছা, কেন্নো ও শামুকের দল। ছোট ও বড় গাছ হইতে খসিয়া পড়া ডালপালা, পাতা মাটিকে আচ্ছাদিত

করে। মাটির উপরে এই আচ্ছাদন বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখে এবং জলধারায় উপরিভাগের মাটির ক্ষয় নিবারিত হয়।

বহির্মৃত্তিকায় **জীবাণু** বাস করে। জীবাণুগুলি ঝরা পাতা ও ডালপালা আক্রমণ করিয়া উহাদের পচাইয়া দেয়। ইহাতে আবর্জনার পরিমাণ কমে এবং বিশ্লিষ্ট উদ্ভিদদেহ হইতে মুক্ত জৈব ও খনিজ পদার্থ মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

ঝোপেঝাড়ে ছায়াযুক্ত স্থানে বনজ গাছপালার বীজ অঙ্কুরিত হয়। জীবাণুর সক্রিয়তায় মাটিতে জৈব ও খনিজ পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। শিশু উদ্ভিদ উহা শোষণ করিয়া বড় হইতে থাকে এবং কালক্রমে মহীরুহে পরিণত হয়।

কেঁচো মাটিতে গর্ত খুঁড়িয়া উহার মধ্যে বাস করে। জীবিত ও মৃত মাটির সূক্ষ্ম উদ্ভিদগুলি কেঁচোর খাদ্য। মাটি খনন করায় উহা ওলট-পালট হয়, নীচেকার খাদ্যোপাদান উপরে চলিয়া আসে। ইহাতে মাটির উর্বরতা বাড়ে। দ্বিতীয়তঃ মাটিতে গর্ত হওয়ায় জল ও বাতাসের অক্সিজেন মাটির গভীরে প্রবেশ করিতে পারে। জল এবং শ্বাসকার্যের জন্য অক্সিজেন পাইলে মূলের সক্রিয়তা অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়।

বৃক্ষ, লতা, গুল্ম ও ঝরা পাতার ফাঁকে ফাঁকে **পতঙ্গকুল** বসতি স্থাপন করে। ইহাদের মধ্যে মৌমাছি, প্রজাপতি, ভীমরুল ফুলের মধু সংগ্রহ করে এবং সেই সঙ্গে এক ফুলের পরাগ অন্য ফুলে বহন করে। পরাগযোগে বীজ উৎপন্ন হয়। বীজ ভবিষ্যতের বংশধর। কোন কোন পতঙ্গ গাছের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভক্ষণ করিয়া অথবা ছালে গর্ত করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে ও উদ্ভিদের জীবন নাশ করে।

কাঠঠোকরা ও পতঙ্গভুক প্রাণী অনিষ্টকারী পতঙ্গগুলি খাইয়া উদ্ভিদের উপকার করে। বৃক্ষকোটর **কাঠবিড়ালীর** আশ্রয়স্থল। ইহারা বাদাম ও অন্যান্য ভক্ষ্য গাছের বীজ অনেক সময়ে মাটির গর্তে লুকাইয়া রাখে এবং পরে ভুলিয়া যায়। উপযুক্ত সময়ে বীজগুলি হইতে নূতন গাছ জন্মায়। **বাজ, পেঁচা** ও অন্যান্য শিকারী পাখী উঁচু ডালে বাসা তৈরী করে। ইঁদুর, কাঠবিড়ালী, খরগোস শিকারী পাখীদের উপাদেয় খাদ্য।

কোন অঞ্চলে একসঙ্গে বসবাসকারী উদ্ভিদ ও প্রাণী নিজেদের মধ্যে এবং পরিবেশের সহিত একটা নিবিড় সম্পর্কসূত্রে আবদ্ধ থাকে। একই পরিবেশে থাকিয়া নিজের যেটুকু করণীয় প্রত্যেক জীব তাহা সুষ্ঠুভাবে পালন করে। এইভাবে বনভূমির মধ্যে জীবগুলি গঠন করে এক বৃহত্তর সমাজ। বন, জলা-ভূমি বা তৃণভূমি লক্ষ্য করিলে এই ধরণের কত রকমের সমাজ তোমাদের চোখে পড়িবে। প্রত্যেক সমাজ স্বয়ংসম্পূর্ণ।

উপরের ঘটনা হইতে একটি জিনিস সহজে বুঝিতে পারা যায়। বনভূমির

প্রত্যেকটি জীব একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়ের জন্য মনুষ্যসমাজের ব্যক্তি-মানব যেমন একে অন্যের উপর নির্ভর করে, ঠিক সেই-রকম। তরুরাজি ছায়া বিস্তার করে। সেই ছায়াতে জন্মায় কত রকমের গুল্ম। শেষোক্ত উদ্ভিদগুলি ফার্ণ ও অন্যান্য বীরুৎ শ্রেণীর উদ্ভিদকে ছায়া দান করে। বীরুতের নীচে আশ্রয় লয় কীটপতঙ্গ। কোন কারণে বৃক্ষরাজি বিনষ্ট হইলে গুল্মের স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন বিঘ্নিত হইবে এবং এই অবস্থা স্থায়ী হইলে উহাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। গুল্ম না থাকিলে ফার্ণ ও অন্যান্য বীরুৎ বাঁচিবে না। মৃত্তিকা সংলগ্ন উদ্ভিদগুলির অনুপস্থিতিতে কীটপতঙ্গ অন্যত্র সরিয়া যাইবে অথবা মরিবে। সুতরাং যদি আশ্রয়ের কথা ধরা যায় তবে বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ যে একটি অপরটির সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

খাদ্যের দিক বিচার করিলে ঠিক এক জিনিস চোখে পড়িবে। জীব মাত্রই আহার্য গ্রহণ করে। খাদ্যের জন্য বিভিন্ন জীব একে অন্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। জীবের মধ্যে একমাত্র সবুজ উদ্ভিদ খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে। সবুজ উদ্ভিদ ক্লোরোফিল ও সৌরশক্তির সহায়তায় জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইড হইতে শর্করা উৎপন্ন করে। যখন শর্করা উৎপন্ন হয়, সৌরশক্তির কিছু অংশ উহাতে স্থৈতিক শক্তিরূপে সঞ্চিত হয়। অন্য উদ্ভিদ বা প্রাণী যখন উদ্ভিদদেহে উৎপাদিত খাদ্য গ্রহণ করে খাদ্যের সহিত স্থৈতিক শক্তিও স্থানান্তরিত হয়।



উদ্ভিদ ও প্রাণী বিভিন্ন খাদ্য-শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এইরূপ দুইটি খাদ্য-শৃঙ্খল উপরে দেখান হইয়াছে। উহাদের সুরু উদ্ভিদে এবং শেষ হয় মাংসাশী প্রাণীতে।

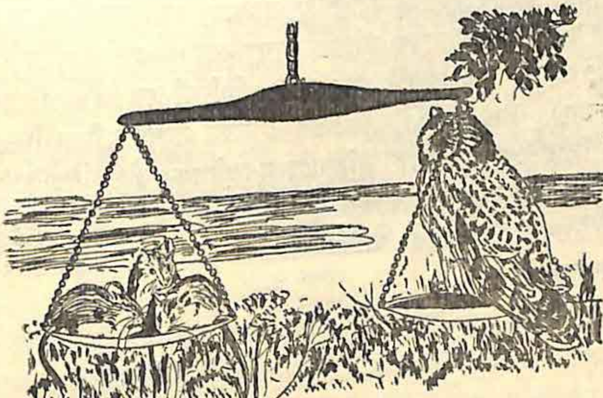
শ্বাসকার্যে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে শর্করা জারিত হইলে স্থৈতিক শক্তি গতীয় শক্তিরূপে বাহির হইয়া আসে ও জীবদেহকে কাজকর্মে শক্তি যোগায়।

খাদ্যের মাধ্যমে সৌরশক্তি একদেহ হইতে অন্যদেহে প্রবেশ করে। অনেক

ছোটখাট পতঙ্গ গাছের পাতা খায়। মাকড়সা পতঙ্গ শিকার করে, কাঠঠোকরা মাকড়সা ভক্ষণ করে; বাজপাখী ধরে কাঠঠোকরাকে। এখানে বাজপাখী কাঠঠোকরার উপর, কাঠঠোকরা মাকড়সার উপর, মাকড়সা পতঙ্গের উপর এবং পতঙ্গ খাদ্যের জন্য গাছপালার উপর নির্ভর করে। খাদ্যের জন্য উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর জীব এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ। আবার গরু, ছাগল, হরিণ ঘাস খায়, মানুষ ইহাদের দুগ্ধ মাংস ব্যবহার করে। ঘাস, তৃণভোজী প্রাণী ও মানুষ ইহারা খাদ্যের জন্য একে অপরের উপর নির্ভর করে। ফড়িঙ গাছের পাতা খায়, ব্যাঙ ফড়িঙ ধরে, সাপের খাদ্য ব্যাঙ, সাপের শত্রু বাজপাখী। অনুসন্ধান করিলে খাদ্যের ব্যাপারে অন্যান্য উদ্ভিদ ও প্রাণীকে পৃথক পৃথক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা যাইবে।

প্রকৃতি উদ্ভিদ ও প্রাণীর ভারসাম্য রক্ষা করে

গাছপালা ও পশুপক্ষী সমেত কোন বনভূমিকে যদি বহু বছর আদিম অবস্থায় ফেলিয়া রাখা যায় তবে দেখা যাইবে ঐ অঞ্চলে উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংখ্যা প্রায় অপরিবর্তিত রহিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ, খাদ্যের ব্যাপারে একই শৃঙ্খলে আবদ্ধ জীবগুলি একে অন্যের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে। বনভূমির অনেক গাছের ফল বা বীজ ইঁদুরে ভক্ষণ করে। যদি কোন কারণে ফল বা বীজের



প্রকৃতি বনভূমির মধ্যে উদ্ভিদ ও প্রাণীর ভারসাম্য বজায় রাখে।

উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ইঁদুর তাহা গ্রহণ করে। খাদ্যের প্রাচুর্যে ইঁদুর দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। বংশবৃদ্ধির ফলে ইঁদুরের সংখ্যা বাড়িয়া যায়। তখন দেখা যায় বনের পেঁচা ছাড়া অন্য স্থান হইতে নূতন পেঁচা বনে আসিয়া ভিড় জমায় এবং অত্যধিক ইঁদুর ভক্ষণ করে। ইহাতে ইঁদুরের সংখ্যা দ্রুত কমিতে থাকে এবং স্বাভাবিক সংখ্যায় পোঁছাইলে খাদ্যের অকুলান হেতু নূতন পেঁচাগুলি স্বস্থানে

প্রস্থান করে। প্রকৃতি বনভূমির মধ্যে এইভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণীর ভারসাম্য বজায় রাখে।

মানুষের হাতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়

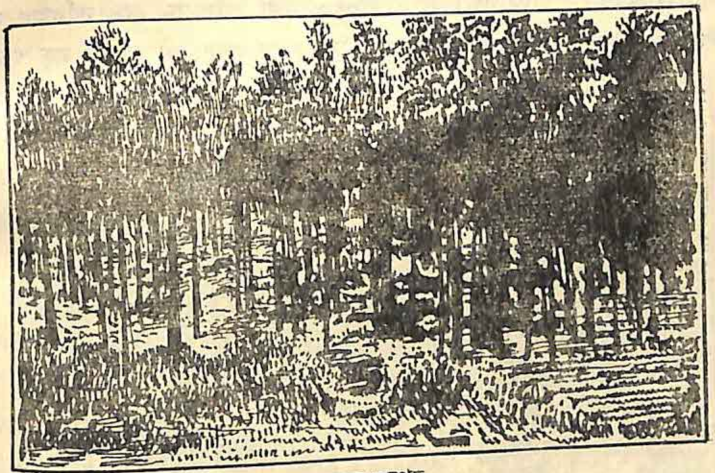
মানুষ কিভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করে তার অনেক নজির আছে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। গুজরাটে কাঠিয়াবাড় প্রদেশের নাম তোমরা শুনিয়া থাকিবে। কাঠিয়াবাড়ে বন্যপশু ও গাছপালায় ঘেরা এক বিখ্যাত অরণ্য আছে। নাম গির জঙ্গল। আয়তন ১৩০০ বর্গ কিলোমিটার। জঙ্গলটি এককালে ছিটকাটা হরিণ, সম্বর, মৃগজাতীয় গ্যাজেল, চারশিঙযুক্ত অ্যান্টিলোপ, নীলগাই, বন্য শূকর ও অন্যান্য প্রাণীতে পরিপূর্ণ ছিল। এই জঙ্গলের প্রধান আকর্ষণ সিংহ। বর্তমানে সিংহ ও অন্যান্য প্রাণীর সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে। ইহার মূলে যে অনেকগুলি কারণ রহিয়াছে, বিজ্ঞানীরা গবেষণার দ্বারা তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। গির জঙ্গলে, হরিণ, সম্বর, অ্যান্টিলোপ প্রভৃতি তৃণভোজী প্রাণীগুলি সিংহের প্রধান খাদ্য। জঙ্গলের কাছে বসবাসকারী আদিবাসীদের অতিরিক্ত মাত্রায় গবাদি পশুচারণের ফলে হরিণ-খাদ্যের অভাব ঘটে। ইহার ফলে তৃণভোজী প্রাণীর সংখ্যা কমিতে থাকে। শেষোক্ত প্রাণীগুলি সংখ্যায় হ্রাস পাওয়ায় সিংহের খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। বাঘ, সিংহ সাধারণতঃ রাত্রে শিকারের সন্ধানে বাহির হয়। কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় ইহারা দিবালোকে আদিবাসীদের গবাদি পশু আক্রমণ করিতে সুরু করে। আদিবাসীরা স্বভাবতঃই গবাদি পশু রক্ষা করিতে সচেষ্ট হয়। এই পরিস্থিতিতে সিংহের পক্ষে বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। গির অরণ্যে আজ তাই সিংহের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। যে যে কারণে সিংহ লোপ পাইতে বসিয়াছে বনভূমিকে তাহা ফিরাইয়া না দিলে সিংহের অবলুপ্তি বন্ধ করা সম্ভব নহে।

বন, উপবন, অরণ্যকে আদিম অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে হইলে চাই **প্রকৃতি সংরক্ষণ।**

১০

প্রকৃতি সংরক্ষণ

আমাদের আজকের পৃথিবী ও আগেকার পৃথিবী এক নহে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। চারিদিকে গড়িয়া উঠিয়াছে হাজার হাজার সহর, কলকারখানা ও সড়ক। বনজংগল পরিবর্তিত হইয়াছে কৃষিজমিতে। এই পরিবর্তন এক দিকে আমাদের যেমন উপকার করিয়াছে অন্য দিকে অপকার করিয়াছে প্রচুর। কৃষিজমি ও ফলের বাগান হইতে খাদ্যের উৎপাদন বাড়িয়াছে। কলকারখানা, শিল্পবাণিজ্য লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্নের সংস্থান করিয়াছে। জাতীয় সড়কগুলি নির্মিত হওয়ায় যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়াছে। কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানীর দ্বারা দেশের



বনজ সম্পদ

অর্থনৈতিক উন্নীত ঘটিয়াছে। অপর দিকে, বনজংগলের বড় বড় গাছপালা কমিয়া যাওয়ায় ভাল জাতের কাঠ ও কাঠের উৎপাদন কমিয়াছে এবং সেই সঙ্গে মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। চাষবাসের ফলে জমির মাটি শিথিল হইয়াছে। বৃষ্টি ও বন্যার জলধারায় ধৌত হইয়া বহির্মৃত্তিকা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। ফলে উৎপাদন কমিয়াছে। নর্দমার জল, কলকারখানার আবর্জনা ও দূষিত জল নদীর জলকে কলুষিত করিতেছে। নদীতে মাছের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে। বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদের সংখ্যা দিনে দিনে কমিয়া যাইতেছে। আজ আমাদের চারিদিকে আছে কেবল যন্ত্রদানব, কৃষিজমি, আবর্জনার স্তূপ ও ক্ষতিকারক প্রাণীর দল।

বেশী। জীবাণু ও ছত্রাক এবং কীটপতঙ্গ অনেক গাছকে সহজে আক্রমণ করিতে পারে না। অপর দিকে চাষের গাছগুলি সহজে রোগ ও কীটপতঙ্গের দ্বারা আক্রান্ত হয়। একই প্রজাতির জংলী গাছ ও চাষের গাছের সংমিশ্রণে সংকর গাছ উত্তোলন করা যায়। এই গাছের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা সাধারণ গাছ অপেক্ষা অনেক বেশী থাকে। ফলে শস্যের ক্ষতি অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। প্রজনন সম্পর্কে গবেষণার জন্য জংলী গাছ অনেক কাজে লাগে। শ্বাসকার্যে আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করি এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করি। সালোক সংশ্লেষে উদ্ভিদ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে ও অক্সিজেন ছাড়িয়া দেয়। বনের গাছপালা বায়ুমণ্ডলকে শোধন করে।

১৯৫২ সালে আমাদের দেশে ন্যাশনাল ফরেস্ট পলিসি নামে এক নীতি প্রণয়ন করা হইয়াছিল। প্রত্যেক রাজ্যকে শতকরা ত্রিশ ভাগ জমি বনভূমি হিসাবে রাখিতে হইবে, ইহাই ছিল ঐ নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য। দুঃখের বিষয় ভারত সরকারের এই নীতির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। রাজ্যগুলিতে শতকরা কুড়ি ভাগেরও কম জমিতে বনভূমি সীমিত রহিয়াছে। আমাদের প্রত্যেকের উচিত এই দিকে দৃষ্টি দেওয়া এবং কৃষিজীবী, শিল্পপতি ও সমাজের সকল স্তরের মানুষকে এ বিষয়ে সচেতন করা।

মৃত্তিকা সংরক্ষণ

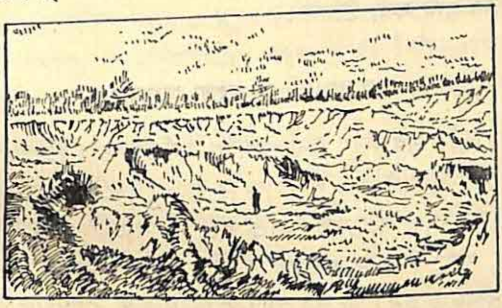
উদ্ভিদজগতের যে সব গাছপালা আমাদের প্রয়োজনে আসে তাহাদের প্রায় সকলেই মাটির উপরে জন্মায়। মাটির উপরিভাগে যে বহির্মৃত্তিকার স্তর আছে আমাদের নিকট তাহার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। কারণ ইহা প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভিদকে এবং পরোক্ষভাবে প্রাণীকুলকে আহার্য যোগাইয়া থাকে।

বহির্মৃত্তিকা কি কি উপাদানে গঠিত তাহা তোমাদের জানা আছে। শিলা-কণা ছাড়া ইহাতে আছে প্রাণশক্তিসম্পন্ন অনেক বস্তু ও নানাবিধ জৈব পদার্থ। বহির্মৃত্তিকা মুক্ত থাকায় ইহাতে আশ্রয় লইয়াছে স্থলবাসী উদ্ভিদ, নানা ধরণের ব্যাকটিরিয়া, আদ্যপ্রাণী, কীটপতঙ্গের লার্ভা ও কেঁচো। ইহাদের কার্যকারিতায় মাটির ভৌত ও রাসায়নিক প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়াছে। বহু বছর ধরিয়া সঞ্চিত হইয়াছে মৃত জীবদেহের বিভিন্ন উপাদান। জল, মাটি হইতে উৎপন্ন অ্যাসিড, জৈব পদার্থ, মৃত্তিকাবাসী জীব ও শিলাকণা একত্রে মিশিয়া গঠন করে আদর্শ বহির্মৃত্তিকা। উপরিভাগের মাটির বহির্মৃত্তিকায় পরিবর্তন সময় সাপেক্ষ। এক ফুট পুরু বহির্মৃত্তিকা গঠিত হইতে প্রায় দশ হাজার বছর অতিবাহিত হইয়া যায়।

বহির্মৃত্তিকা নানাভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। প্রবল বৃষ্টিপাতের সময়ে উন্মুক্ত স্থানে বাহির হইয়া পড়িলে জলধারায় প্রকৃতির বুকে কোথায় কি ঘটিতেছে

তাহা সচক্ষে দেখিতে পাইবে। গাছপালা ঘেরা অঞ্চলে যখন বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টির ফোঁটা গাছের পাতায় পড়িয়া আরও ক্ষুদ্র কণায় বিভক্ত হয় এবং অনেক কম গতিতে মাটিতে ঝরিয়া পড়ে। মাটিতে পড়িয়া থাকা শুকনো পাতা কিছুটা জল শোষণ করিয়া লয়। তৃণভূমিতে বৃষ্টি পড়িলে একই অবস্থা ঘটে। জমি যদি ঢালু হয় তবে জল ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামিতে থাকে। এইরূপ মন্থর জলপ্রবাহে বহির্মৃত্তিকা ধুইয়া বাহির হইয়া যায় না।

সদ্য লাঙ্গল দেওয়া জমি বা যে জমিতে সবুজের কোন চিহ্ন নাই এমন জায়গায় যখন বৃষ্টি পড়ে; বৃষ্টির ফোঁটাগুলি মাটির বুকে সজোরে আঘাত করে। ইহাতে বহির্মৃত্তিকা আলগা হইয়া পড়ে এবং জলের সহিত ধুইয়া বাহির



বৃষ্টির জলধারায় ক্ষয়প্রাপ্ত বহির্মৃত্তিকা

হইয়া যায়। গাছপালা নষ্ট করিলে, তৃণভূমি গবাদি পশুর দ্বারা নিঃশেষিত হইলে, বন কাটিয়া ফেলিলে মাটির অবক্ষয় রোধ করা যায় না। মাটির উপর জলপ্রবাহের ফলে ছোট-বড় নালার সৃষ্টি হয় এবং বহুদিন পরে উহাদের গভীরতা বৃদ্ধি পাইয়া খাদে পরিণত হয়।

শুষ্ক অঞ্চলে বা খরা চলিতে থাকিলেও জমি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তৃণহীন জমির মৃত্তিকা-কণা বাতাসের ধাক্কায় অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়। দেখা গিয়াছে, যখন ধূলিঝড় বহিতে থাকে জমি হইতে কয়েক টন মাটি বাতাসে উড়িয়া চলিয়া যায়। এই মাটি অনাবাদি জমি, নদী অথবা সমুদ্রে পতিত হয়। ইহা বহির্মৃত্তিকার অপচয় ছাড়া আর কিছু নহে।

অনেক সময়ে জলাধারের নিকটবর্তী জমিতে বৃষ্টির জল চুয়াইয়া নীচের দিকে চলিয় যায় এবং উহার সহিত মৃত্তিকার খনিজ পদার্থ লইয়া যায়। ইহা জলস্রোতে মিশিয়া অন্যত্র বাহিত হয়। মৃত্তিকার খনিজ পদার্থ ধৌত হইলে উহা অনুর্বর হইয়া পড়ে। অনুর্বর জমি হইতে উদ্ভিদ প্রয়োজনীয় উপাদান-গুলি পায় না এবং মানুষ এইরূপ জমি হইতে উৎপন্ন ফসল খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করিলে প্রয়োজনীয় খনিজ দ্রব্য হইতে বঞ্চিত হয়।

মৃত্তিকার অবক্ষয় নানাভাবে বন্ধ করা যায়। জমির ধারে বড় বড় নালা

কাটিয়া রাখিলে, ঢালু জমিতে ঘাস ও অন্যান্য গাছপালা লাগাইয়া দিলে বহির্মৃত্তিকা ধুইয়া যাইতে পারে না। মাটি ধৌত হইলেও নালার মধ্যে আসিয়া পুনরায় থিতাইয়া পড়ে এবং গাছপালার শিকড় মাটিকে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখে। যে সব ফসলের গাছ দৈর্ঘ্যে বড়, ঢালু জমিতে সেই সব গাছের চাষ করিলে বাতাসের দ্বারা মাটির অবক্ষয় বন্ধ করা যায়।

তৃণভূমিতে গবাদি পশুচারণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া মৃত্তিকার ক্ষয় বন্ধ করা যায়। কোন তৃণভূমিতে অধিক সংখ্যায় পশুচারণ করিলে অল্পদিনের মধ্যে তৃণভূমির ঘাস নিঃশেষিত হয়। নূতন ঘাস জন্মাইতে না পারিলে বহির্মৃত্তিকা অনাবৃত হইয়া পড়ে ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তৃণভূমি এই অবস্থায় পৌঁছাইলে পশুচারণ কিছুদিনের জন্য বন্ধ করা উচিত।

বন্যপ্রাণী ও মৎস্য সংরক্ষণ

বনভূমি ও মৃত্তিকার ন্যায় বন্য প্রাণীও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। অপব্যবহারের ফলে এবং অন্যান্য কারণে বন্য পশুপক্ষীর সংখ্যা দিনে দিনে কমিয়া যাইতেছে। ইহাতে আমাদের কোন গুরুতর ক্ষতি হয় না বটে, তবে বনভূমির সৌন্দর্য উপভোগ করা, পশু শিকার প্রভৃতি ক্রীড়ার আনন্দ হইতে বঞ্চিত হই। মাছ খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মাছের প্রাদুর্ভাব ঘটিলে সরবরাহ কমিয়া যায় এবং সেই সঙ্গে মূল্য বৃদ্ধি পায়।

অনেক সময়ে প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ বন্যপ্রাণী হত্যা করে। বাঘ, নেকড়ে বাঘ, মানুষ ও গবাদি পশুর উপর আক্রমণ চালাইলে, হরিণ গাছপালা নষ্ট করিলে অথবা কাঠবিড়ালী শস্যের ক্ষতি করিলে উহাদের মারিয়া ফেলা হয়। কিন্তু অকারণে পুরস্কার বিজয়ের আশায় বা শিকারের নেশায় ইহাদের হত্যা করা অপব্যবহার ছাড়া আর কিছু নহে। বন্য পশুর সাথে সাথে বন্য পাখীদের নিধন-যজ্ঞ সমান তালে চলিতেছে। কিন্তু পাখীদের দৌলতে পোকা-মাকড়ের উপদ্রব অনেক কম থাকে এবং গাছপালা ও শস্যের ক্ষতির পরিমাণ অনেকখানি হ্রাস পায়। দ্বিতীয়তঃ বন ও জলাভূমি বন্য পশুপক্ষী ও জলচর পাখীর আবাসস্থল। নিজ নিজ পরিবেশে থাকিয়া উহারা খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করে। আবাসস্থল ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, খাদ্যের অভাব দেখা দিলে প্রাণীগুলি অন্যত্র চলিয়া যায়, দেশান্তরী হয় এবং কোন উপায় না থাকিলে মৃত্যুবরণ করে। ফলে উহাদের সংখ্যা কমিতে থাকে এবং পরিশেষে ধরাপৃষ্ঠ হইতে সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত হয়।

দেখা গিয়াছে, বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রায় চারিশত প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী অবলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। ভারতবর্ষে লুপ্তপ্রায় প্রাণীর সংখ্যা কম নহে। ১৯০০ সালে ভারতে বাঘের সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার। বর্তমানে সমগ্র

ভারতে বাঘের সংখ্যা মাত্র দুই হাজার। বাঘের সেরা রয়েল বেঙ্গল টাইগার ভারত ছাড়া পৃথিবীর আর কোন স্থানে পাওয়া যায় না। নির্বিচারে বাঘ শিকার, বাঘের খাদ্য হরিণ শিকার এবং হরিণ-খাদ্যের উৎস বন ও তৃণভূমি ধ্বংস করিয়া কৃষিজমি ও শিল্পকেন্দ্র স্থাপন, সড়ক নির্মাণ প্রভৃতি কারণে ব্যাঘ্রকুল আজ অবলুপ্তির পথে। অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া মৃগনাভির লোভে শিকারী কস্তুরী-মৃগকে এবং শিঙের লোভে গণ্ডারকে ভারতের বন হইতে নিশ্চিহ্ন করিতে চলিয়াছে। গুজরাটের কাঠিয়াবাড় প্রদেশে গির জঙ্গলে পূর্বে অনেক সিংহ দেখা যাইত। বর্তমানে ইহার সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে। ছিটকাটা হরিণ, সম্বর, সুদৃশ্য দ্রুতগামী মৃগ গ্যাজেল, নীলগাই, বন্য শূকর এবং পৃথিবীর একমাত্র চার-শিঙযুক্ত মৃগজাতীয় প্রাণী অ্যাণ্টিলোপ, যাহা গির জঙ্গলে এককালে শোভা বর্ধন করিত, আজ তাহা নিশ্চিহ্নপ্রায়। ভারতীয় শিকারী চিতা আজ আর নাই। পাখীদের মধ্যে ধনেশ, তিতির, শামুকখল, জলপিপি, কাদাখোঁচা প্রায় নাই বলিলেই হয়।

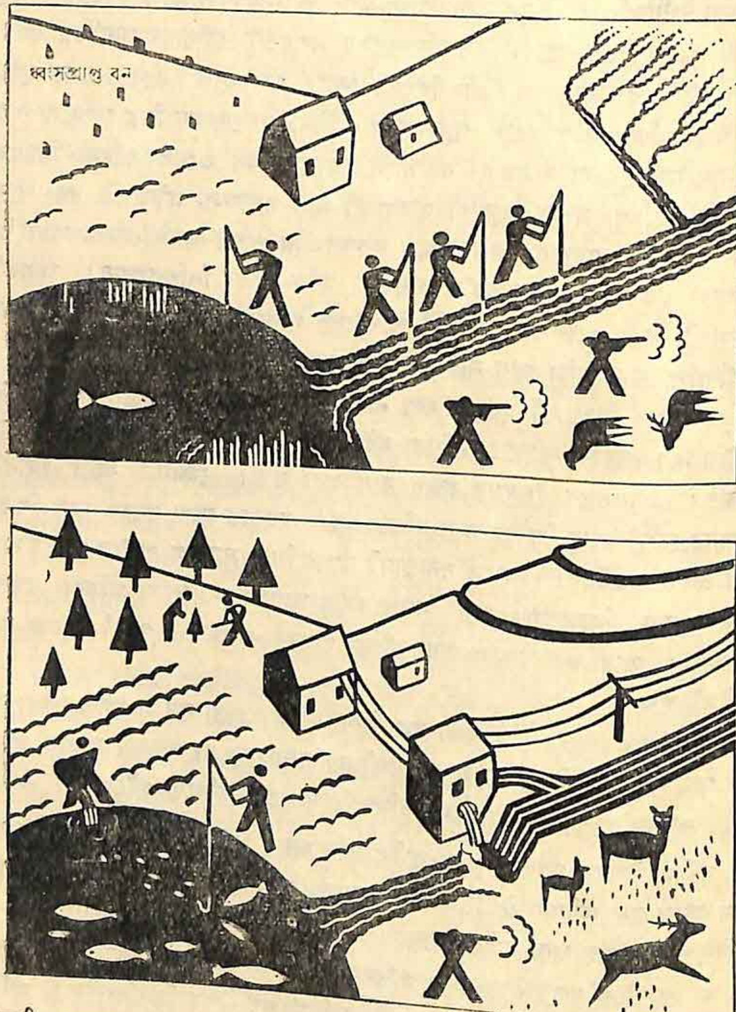
অকারণে বন্যপ্রাণী হত্যা বন্ধ না করিলে ইহাদের অবলুপ্তি রোধ করা যাইবে না। ইহারা যাহাতে নিশ্চিহ্ন হইয়া না যায় সেদিকে সকলের দৃষ্টি রাখা উচিত। নানাভাবে ইহাদের হত্যা বন্ধ করা যায়। যেমন, বছরে নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশী পশু শিকার করা চলিবে না। বছরের মধ্যে কয়েক মাস শিকার বন্ধ রাখিতে হইবে। ইহাতে বন্যপ্রাণী বংশবৃদ্ধির সুযোগ পাইবে। বর্তমানে বন্যপশুদের নিরাপত্তার জন্য বনের মধ্যে সংরক্ষিত অঞ্চল গড়িয়া তোলা হইয়াছে। সংরক্ষিত অঞ্চলে বাঘ, হরিণ, গণ্ডার ও অন্যান্য প্রাণী শিকার করা আইনবিরুদ্ধ।

পাখীদের ক্ষেত্রেও এই কথা বলা যায়। ইহা ছাড়া বন সংরক্ষণ দ্বারা বড় বড় গাছপালা সুরক্ষিত থাকিলে পাখীদের বাসস্থান বা খাদ্যের অভাব হইবে না। জলচর পাখীদের জন্য জলাভূমিগুলিকে রক্ষা করিতে হইবে।

কৃত্রিম উপায়ে মাছের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। কৃত্রিম প্রজনন দ্বারা মাছের ডিম উত্তোলন করিয়া ঐ ডিম হইতে বাচ্চা ফুটাইয়া দেশের সর্বত্র জলাশয়-গুলিতে সরবরাহ করা যাইতে পারে।

বন্যপ্রাণীকে স্বাভাবিক বন্য পরিবেশে বাস করিতে দেওয়া বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের সবচেয়ে ভাল উপায়। জীব পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। অভি-যোজন দ্বারা জীব নিজেকে পরিবেশের উপযোগী করিয়া তুলে। যোগ্য পরিবেশে জীব স্বচ্ছন্দে জীবন কাটায়। পরিবেশ অনুপযুক্ত হইলে জীব অসুবিধার সম্মুখীন হয়, এমনকি মৃত্যু হওয়া অস্বাভাবিক নহে। বন্যপ্রাণীকে রক্ষা করিতে হইলে বিধ্বস্ত বনভূমিকে আদিম অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে হইবে। বিধ্বস্ত বনভূমিতে গাছপালা লাগাইয়া দাও। গাছগুলি বৃক্ষে পরিণত

হইলে শিকারের পাখী, গাইয়ে পাখী একে একে ফিরিয়া আসিয়া গাছে বাসা বাঁধিবে। লোমশ প্রাণী ক্রমশঃ বনে ভিড় জমাইতে থাকিবে। তীক্ষ্ণ দন্ত ইঁদুরাদি প্রাণীর শত্রু বাজ, পেঁচা গাছের উঁচু ডালে আশ্রয় লইবে। মাটির



প্রকৃতি থেকে দোহনের ফলে আজ প্রকৃতির ভাণ্ডার শূণ্য হতে চলেছে। সুপরিকল্পিতভাবে প্রকৃতিকে ব্যবহার করলে মানবসমাজে প্রাকৃতিক সম্পদ সরবরাহ অক্ষুণ্ণ থাকবে।

ক্ষয় নিবারণের জন্য বাঁধ নির্মাণ করিলে বা খাদ খনন করিলে জলাভূমিতে হাঁস, বক ও অন্যান্য জলচর পাখীর আবির্ভাব ঘটিবে।

সংরক্ষণের জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে

পরিকল্পনাহীন সংরক্ষণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বন সংরক্ষণ করিতে হইলে বন্যপ্রাণীদের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যেমন ধর, কোন বনে যদি হরিণের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায় তবে উহাদের স্বাভাবিক আহার্য-দ্রব্যের অভাব দেখা দিবে। তখন বন সংরক্ষণের জন্য লাগান বড় গাছের চারাগুলি উহাদের ভক্ষ্য হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে এক জিনিসের সংরক্ষণ অন্য জিনিসের সংরক্ষণে বাধাসৃষ্টি করিবে। এই অবস্থায় বাড়তি হরিণ মারিয়া ফেলা ছাড়া অন্য উপায় থাকিবে না। সুতরাং কৌশলের সহিত সংরক্ষণ ব্যবস্থা পরিচালনা করা প্রয়োজন। কোন বনে কি কি ধরণের পশুপক্ষী এবং কতগুলি প্রাণী ভালভাবে বাস করিতে পারিবে, কিভাবে উহাদের নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহা ভাবিতে হইবে। পুকুর, হ্রদ ও নদীর জলে কি ধরণের মাছের খাদ্য কি পরিমাণে আছে এবং সেখানে কোন কোন মাছ কত সংখ্যায় রাখা যায় তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। মানুষের চাহিদা অনুযায়ী কোন কোন প্রাণী কি পরিমাণে খরচ হইতেছে তাহার হিসাব রাখিতে হইবে। এক কথায় সংরক্ষণ ও সরবরাহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে হইবে। তাহা হইলে প্রকৃতির সম্পদ অক্ষুণ্ণ ও চিরপ্রবহমান থাকিবে।

বিভিন্ন ধরণের সংরক্ষণ পরস্পরের সহিত জড়িত

বনাগ্নিতে যখন সমগ্র বন বিধ্বস্ত হয়, উহার সহিত বন্যপ্রাণীদের জীবন নাশ হয় এবং মৃত্তিকা অনাবৃত হইয়া পড়ে। বন সংরক্ষিত হইলে উহা হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। বনের গাছপালা মাটির অবক্ষয় বন্ধ করে। পশুপক্ষী, জলচর পাখী স্বচ্ছন্দে নিজ নিজ পরিবেশে দিন যাপন করে। প্রকৃতির এই সৌন্দর্য উপভোগ করে মানুষ। বনের মধ্যে মাছধরা, শিকার, ক্রীড়া-কৌতুক ও আমোদ-প্রমোদ মানুষের মনকে অবসাদমুক্ত করিয়া তুলে।

উপসংহার

প্রাকৃতিক ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ রাখাই সংরক্ষণ। মানুষকে নিজের প্রয়োজনে বন, মৃত্তিকা, বন্যপ্রাণী ও কীটপতঙ্গকে রক্ষা করিতেই হইবে। বিচারবুদ্ধির দ্বারা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করিলে সংরক্ষণ সার্থক হইবে। দুঃখের বিষয়, আমাদের অজ্ঞতা বা অসাবধানতার ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ যখন বিপর্যস্ত হয় কেবল তখনই আমরা সংরক্ষণের কথা চিন্তা করি। প্রাচুর্যের সময়ে এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন থাকি। বর্তমান অবস্থা আমাদের সংরক্ষণে বাধ্য করিয়াছে এবং জনগণের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত অবশ্যই ইহাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

১১

কার্বন-চক্র, অক্সিজেন-চক্র ও নাইট্রোজেন-চক্র

শর্করা, প্রোটীন এবং স্নেহদ্রব্য আমাদের খাদ্যের তিনটি প্রধান উপাদান। উপরোক্ত তিনটি উপাদানেই কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন মৌলগুলি থাকে। কেবল প্রোটীনে একটি মৌল বেশী থাকে এবং তাহা হইল নাইট্রোজেন। শর্করা অতিরিক্ত অক্সিজেনের সহিত জারিত হইয়া দেহকে শক্তি যোগায়, প্রোটীন প্রোটোপ্লাজম গঠন করে এবং স্নেহদ্রব্য শক্তি সঞ্চয় করিয়া রাখে।

পৃথিবীর ভান্ডারে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ সীমাবদ্ধ। ইহা বাড়েও না, কমেও না। পৃথিবীর বুকে জীবনকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে এই মৌলগুলিকে বারে বারে ব্যবহার করিতে হইবে। অনেক সময়ে মৌলগুলি কোন বস্তু বা পদার্থে সাময়িকভাবে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। কিন্তু শেষে উহারা মুক্ত হয় এবং জীব উহাদের ব্যবহার করে। কয়লার মধ্যে যে কার্বন আছে তাহা কোটি কোটি বছর ধরিয়া ঐ অবস্থায় ভূগর্ভে পড়িয়া আছে। কিন্তু কয়লা পুড়াইলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বাহির হইয়া আসে। উদ্ভিদ ঐ গ্যাস ব্যবহার করে এবং সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড শর্করায় পরিণত হয়।

তোমরা জল-চক্রের কথা শুনিয়া থাকিবে। ছোট, বড় সব রকমের জলাশয় হইতে জল বাষ্পীভূত হয়। বাষ্পমোচন দ্বারা উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণে জল ত্যাগ করে। জলীয় বাষ্প বায়ুমন্ডলে মিশিয়া যায়। ঠান্ডা বাতাসের সংস্পর্শে বাষ্প ঘনীভূত হইয়া বৃষ্টির আকারে পৃথিবীর বুকে ফিরিয়া আসে। উদ্ভিদ ও প্রাণীকোষের প্রোটোপ্লাজমে যে মৌলগুলি বিদ্যমান, উহারাও জল-চক্রের মত চক্রবৎ ঘুরিতে থাকে।

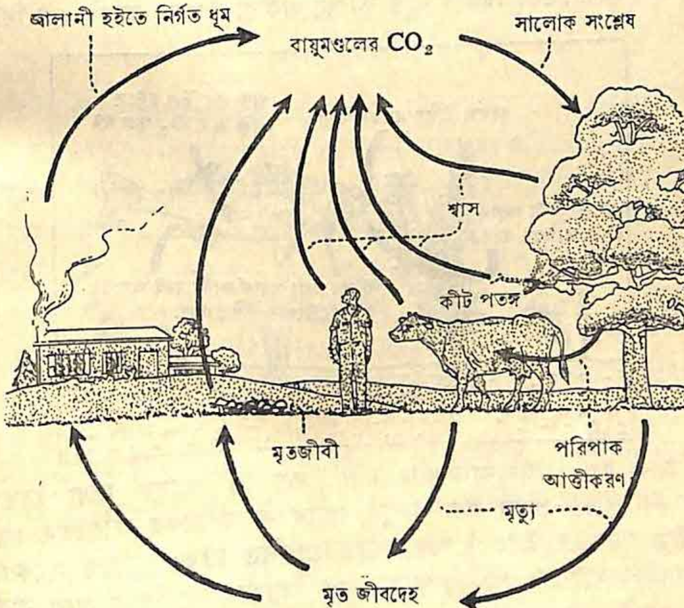
কার্বন-চক্র

সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড অপরিহার্য। সবুজ উদ্ভিদ বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করিয়া শর্করা প্রস্তুত করে। উদ্ভিদদেহে উদ্বৃত্ত শর্করা শ্বেতসারে অথবা স্নেহদ্রব্যে পরিবর্তিত হয়। নাইট্রোজেন, গন্ধক ও ফসফরাস শর্করার সহিত যুক্ত হইলে প্রোটীন উৎপন্ন হয়। প্রাণী যখন উদ্ভিদ বা উদ্ভিদজাত পদার্থ ভক্ষণ করে, উদ্ভিদদেহের কার্বন প্রাণী-দেহে চলিয়া আসে। আত্তীকরণ দ্বারা প্রাণী এই কার্বনকে নিজ দেহে মিশাইয়া দিতে পারে অথবা কার্বন অক্সিজেনের সহিত জারিত হইয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড

পরিণত হইতে পারে। কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসে মিশিয়া যায় এবং যে কোন সবুজ উদ্ভিদ এই গ্যাস ব্যবহার করিতে পারে।

পতঙ্গ গাছের পাতা খায়। ইহাতে উদ্ভিদদেহের কার্বন পতঙ্গের দেহে চলিয়া আসে। কার্বন পতঙ্গের দেহগঠনের কাজে লাগিতে পারে অথবা কার্বন ডাই-অক্সাইডরূপে বায়ুমণ্ডলে ফিরিয়া যাইতে পারে। উদ্ভিদদেহে ঠিক একই ব্যাপার ঘটিতে দেখা যায়। শর্করা উদ্ভিদের দেহ গঠন করে অথবা অক্সিজেনের সহিত জারণের ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। গাছটি নিজে বা অন্য কোন সবুজ উদ্ভিদ এই কার্বন ডাই-অক্সাইড পুনরায় ব্যবহার করিতে পারে।

অনেক উদ্ভিদ প্রাণীদের ভক্ষ্য নহে। গাছগুলি যখন মরিয়া যায় বা ইহাদের ডালপালা, পাতা মাটিতে ঝরিয়া পড়ে তখন ঐগুলি জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হয়। গলিত জৈব পদার্থে জীবাণু ছাড়া মৃতজীবী ছত্রাক জন্মলাভ করিতে পারে। জীবাণু বা মৃতজীবী ছত্রাক গলিত জীবদেহ হইতে যখন খাদ্য সংগ্রহ



কার্বন চক্র; জীবজগতের পুষ্টির জন্য বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড বারংবার ব্যবহৃত হয়।

করে তখন জীবদেহের কার্বন জারিত হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসে মিশিয়া যায়।

অতএব দেখা যাইতেছে একই কার্বন বারে বারে ব্যবহৃত হইতেছে। কার্বন পরমাণুগুলি জীবদেহ হইতে বায়ুমণ্ডল এবং বায়ুমণ্ডল হইতে জীবদেহে

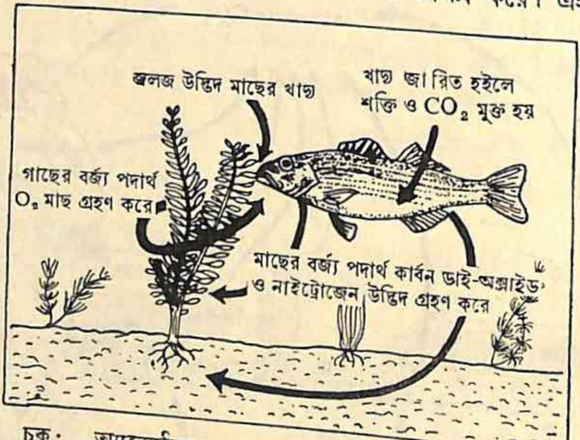
চক্রবৎ ঘুরিতেছে। ইহাই কার্বন-চক্র। কার্বন-চক্র না থাকিলে পৃথিবীর কার্বন এতদিনে নিঃশেষ হইয়া যাইত।

অক্সিজেন-চক্র

বায়ুমণ্ডলে শতকরা কুড়ি ভাগ মুক্ত অক্সিজেন আছে। প্রতি মুহূর্তে বাতাসের অক্সিজেন ব্যবহৃত হইতেছে এবং নূতন অক্সিজেন বায়ুতে ফিরিয়া আসিতেছে। ইহার ফলে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে।

শ্বাসকালে উদ্ভিদ ও প্রাণী অক্সিজেন গ্রহণ করে। অক্সিজেন খাদ্যের কার্বন ও হাইড্রোজেনের সহিত যুক্ত হইয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল উৎপন্ন করে। অর্থাৎ অক্সিজেনের সংস্পর্শে খাদ্যবস্তু জারিত হইলে উহা ভাঙিয়া জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয় এবং খাদ্যবস্তুতে নিহিত স্থৈতিক শক্তি গতীয় শক্তিরূপে বাহির হইয়া আসে।

দিনের বেলা উদ্ভিদের সবুজ কোষগুলি সৌরশক্তির সহায়তায় জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইডকে একত্রে যুক্ত করিয়া শর্করা উৎপন্ন করে। এই বিক্রিয়ায়



অক্সিজেন চক্র; **অ্যাকোরিয়ামে রাখা মাছ ও গাছের মধ্যে যেভাবে অক্সিজেন আদান-প্রদান হয়, অনুরূপভাবে বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন প্রাণী হইতে উদ্ভিদে এবং উদ্ভিদ হইতে প্রাণীতে চক্রবৎ ঘুরিতে থাকে।**

কার্বন ডাই-অক্সাইডের সবটুকু কার্বন এবং অক্সিজেনের কিছু অংশ ব্যবহৃত হয়। জলের হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি শর্করা উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে, অক্সিজেন পড়িয়া থাকে। কার্বন ডাই-অক্সাইডের অব্যবহৃত অক্সিজেন ও জলের অক্সিজেনের খানিকটা অংশ পুনরায় হাইড্রোজেনের সহিত মিলিত হইয়া জলে পরিণত হয় এবং অবশিষ্টাংশ মুক্ত অক্সিজেনরূপে পত্ররন্ধ্র দিয়া বাহিরে চলিয়া আসে ও বায়ুমণ্ডলে মিশ্রিত হয়। উদ্ভিদকোষ বায়ু হইতে যে পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে, ঠিক সেই পরিমাণ অক্সিজেন বাতাসে ছাড়িয়া দেয়। উদ্ভিদ এইভাবে বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনকে বার বার ব্যবহার করে।

কলকারখানার চিমনী হইতে নির্গত ধূম বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়াইয়া দেয়। সালোক সংশ্লেষে সবুজ গাছপালাগুলি এই কার্বন ডাই-অক্সাইডকে কাজে লাগায় এবং ইহার পরিবর্তে অক্সিজেন পরিত্যাগ করে। নির্গত অক্সিজেন তোমার বা অন্যান্য প্রাণী কিংবা উদ্ভিদের শ্বাসে ব্যবহৃত হইতে পারে।

তোমাদের অনেকে বাড়ীতে অ্যাকোয়রিয়ামে সুদৃশ্য রঙীন মাছ রাখ। মাছের সংগে কিছু জলজ গাছপালাও থাকে। যদি গাছপালা না থাকে তবে কয়েক দিনের মধ্যে মাছগুলি মরিয়া যাইবে। মাছ ও জলজ গাছগুলি শ্বাস-কার্যের জন্য জল হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং জলে কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়িয়া দেয়। আলোকের উপস্থিতিতে গাছগুলি জল হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করিয়া শর্করা প্রস্তুত করে ও অক্সিজেন ছাড়িয়া দেয়। ইহার ফলে অ্যাকোয়রিয়ামের জলে কখনও অক্সিজেনের অভাব হয় না। মাছ ও গাছ স্বচ্ছন্দে জীবন কাটায়।

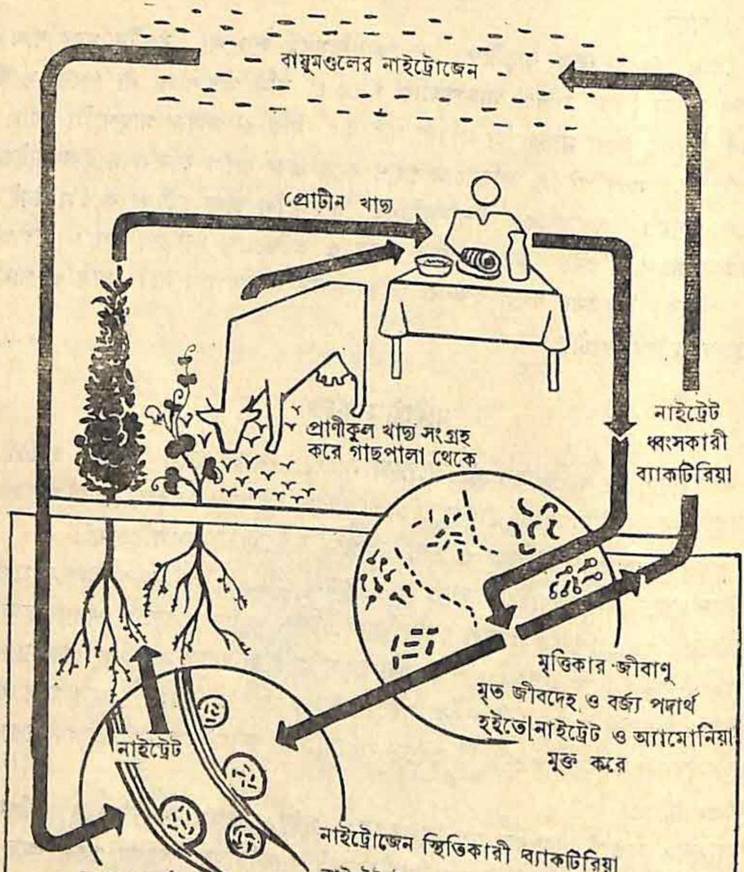
নাইট্রোজেন-চক্র

কার্বন-চক্র ও অক্সিজেন-চক্র অপেক্ষা নাইট্রোজেন-চক্র বেশ কিছুটা জটিল। তোমরা জান প্রোটীন নাইট্রোজেনযুক্ত যৌগ পদার্থ। ইহা জীবদেহে প্রোটোপ্লাজম গঠন করে। সুতরাং উদ্ভিদ ও প্রাণীর পক্ষে নাইট্রোজেন অপরিহার্য।

বায়ুমণ্ডলে শতকরা ৮০ ভাগ নাইট্রোজেন আছে। অধিক পরিমাণে মুক্ত নাইট্রোজেন থাকা সত্ত্বেও কয়েক প্রকার ব্যাকটিরিয়া ও এক জাতের শৈবাল ছাড়া সাধারণ উদ্ভিদ বায়ু হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করিতে পারে না। মৃত্তিকা-রসে দ্রবীভূত নাইট্রেট লবণ উদ্ভিদের নাইট্রোজেনের প্রধান উৎস। তবে ঘাস ও তণ্ডুল জাতীয় শস্যের গাছ মাটি হইতে অ্যামোনিয়া যৌগরূপে নাইট্রোজেন গ্রহণ করিতে পারে।

মাটিতে নাইট্রেট উৎপন্ন হয় দুইভাবে। মটর, ছোলা, বরবটি প্রভৃতি শিম জাতীয় গাছের মূলে নাইট্রোজেন-স্থিতিকারী ব্যাকটিরিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। উহারা বায়ু হইতে গ্যাসীয় নাইট্রোজেন লইয়া ইহাকে নাইট্রেটে পরিণত করিতে পারে। ব্যাকটিরিয়া গাছকে নাইট্রেট যোগায় এবং পরিবর্তে উহার নিকট হইতে শর্করা খাদ্য গ্রহণ করে। উহারা পরস্পর অন্যোন্যজীবীত্বের ভীত্তিতে বসবাস করে। ইহা ছাড়া, মৃত্তিকায় স্বাধীনভাবে বসবাসকারী নাইট্রোজেন-স্থিতিকারী ব্যাকটিরিয়া আছে। ইহারা বায়ুমণ্ডলের মুক্ত নাইট্রোজেনকে অ্যামোনিয়া যৌগে পরিণত করে। মাটির ভিতরস্থ এক প্রকার ব্যাকটিরিয়া অ্যামোনিয়া যৌগকে নাইট্রাইট লবণে পরিবর্তিত করে। উদ্ভিদ নাইট্রাইট লবণ গ্রহণ করিতে পারে না। নাইট্রাইট লবণ অন্য এক প্রকার ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা নাইট্রেটে পরিণত হয়।

অ্যামোনিয়া যৌগ ও নাইট্রেট মৃত্তিকার জলে গলিয়া যায়। উদ্ভিদ উহা গ্রহণ করিয়া প্রোটোপ্লাজম গঠন করে। এই কারণে মাটিতে নাইট্রোজেনযুক্ত লবণের পরিমাণ কম থাকিলে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। প্রাণীদের ক্ষেত্রে খাদ্যে প্রোটীনের অভাব ঘটিলে দেহ স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায় না।



নাইট্রোজেন বায়ু হইতে জীবদেহে এবং জীবদেহ হইতে বায়ুতে ফিরিয়া আসে। নাইট্রোজেনের এই অবিরাম পরিক্রমণকে নাইট্রোজেন-চক্র বলা হয়। লক্ষ্য করিলে সমগ্র চক্রটির মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট চক্র নজরে পড়িবে।

প্রাণী যখন গাছপালা বা শাকসব্জী ভক্ষণ করে তখন উদ্ভিদদেহের নাইট্রোজেন প্রাণীদেহে চলিয়া আসে এবং ইহা হইতে প্রাণীকোষে প্রোটোপ্লাজম গঠিত হয়। নাইট্রোজেন যদি ক্রমাগত মাটি হইতে উদ্ভিদদেহে এবং উদ্ভিদদেহ হইতে

প্রাণীদেহে চলিয়া আসে তবে অচিরে মাটির নাইট্রোজেন নিঃশেষ হইবে। মাটিতে নাইট্রোজেন ফিরিয়া না আসিলে উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী।

সুখের বিষয়, নাইট্রোজেন জীবদেহে প্রবেশ করিলে উহার সবটুকু বরাবরের জন্য জীবদেহে থাকিয়া যায় না। প্রাণীদেহ হইতে বর্জ্য পদার্থ পরিত্যক্ত হয়। উহার সহিত নাইট্রোজেনযুক্ত পদার্থ ইউরিয়া বাহির হইয়া আসে। মাটির ব্যাকটিরিয়া ইউরিয়াকে অ্যামোনিয়া যৌগে পরিণত করে। গাছ হইতে যখন পাতা ঝরিয়া পড়ে কিংবা উদ্ভিদদেহ ও প্রাণীদেহের মৃত্যু হয়, মাটিতে বসবাসকারী অন্যান্য ব্যাকটিরিয়া জীবদেহ পচাইয়া দেয়। ব্যাকটিরিয়ার কার্যকারিতায় জীবদেহের জৈব পদার্থ হইতে অ্যামোনিয়া যৌগ উৎপন্ন হয়।

প্রাণী যে কেবল উদ্ভিদদেহ হইতে নাইট্রোজেনযুক্ত পদার্থ আহরণ করে তাহা নহে। অনেক সময়ে একটি প্রাণী অপর একটি প্রাণীকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। তখন নাইট্রোজেন এক প্রাণীদেহ হইতে অন্য প্রাণীদেহে প্রবেশ করে।

যে মাটিতে নাইট্রেট লবণের পরিমাণ বেশী থাকে তথায় এক ধরণের ব্যাকটিরিয়া বাস করে। এই ব্যাকটিরিয়া নাইট্রেট লবণকে ভাঙ্গিয়া নাইট্রোজেনকে মুক্ত করিয়া দেয়। নাইট্রোজেন মুক্ত হইয়া বায়ুমন্ডলে মিশিয়া যায়। এইভাবে মাটির নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডলে ফিরিয়া আসে।

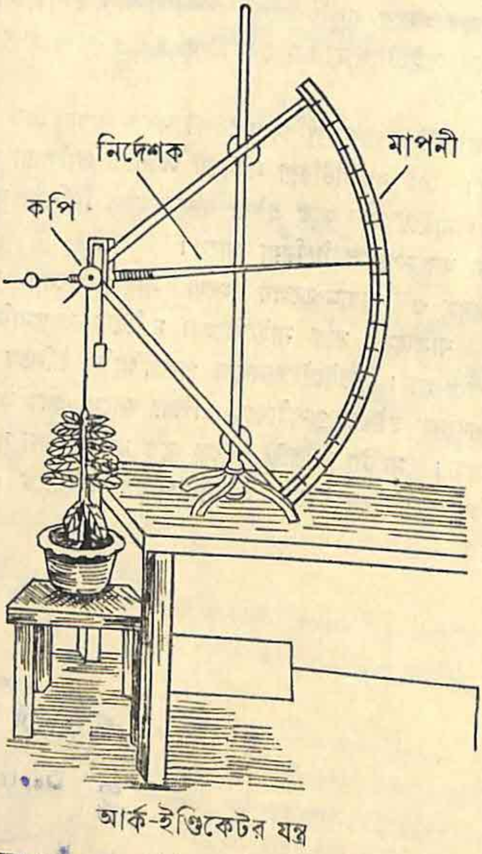
মাটি, জীবদেহ ও বায়ুমণ্ডলের মধ্যে নাইট্রোজেনের আদান-প্রদানই নাইট্রোজেন-চক্র। বাতাসের মুক্ত নাইট্রোজেন মাটিতে অ্যামোনিয়া যৌগ বা নাইট্রেটরূপে সঞ্চিত হয়। নাইট্রোজেনযুক্ত পদার্থগুলি উদ্ভিদ শোষণ করে। নাইট্রোজেন উদ্ভিদদেহ হইতে প্রাণীদেহে চলিয়া আসে এবং জীবদেহ হইতে মাটিতে চলিয়া যায়। মাটির নাইট্রেট হইতে মুক্ত নাইট্রোজেন বাতাসে মিশ্রিত হয়। অনেকগুলি ছোট ছোট চক্র লইয়া গঠিত হইয়াছে একটি বৃহত্তর নাইট্রোজেন-চক্র।

১২

ব্যবহারিক

১। গাছের বৃদ্ধি যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা ও পরিমাপ করা যায়

শৈশবে গাছ যে প্রতিমুহূর্তে দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পায় তাহা অতি সামান্য হওয়ায় আমাদের চোখে পড়ে না। দুই তিন দিন অন্তর গাছটি লক্ষ্য করিলে বৃদ্ধি বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু গাছ প্রতি ঘণ্টায় বা মিনিটে কতখানি বাড়ে তাহা যন্ত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়।

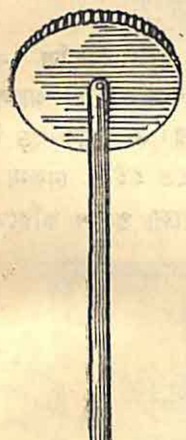


আর্ক-ইণ্ডিকেটর যন্ত্র

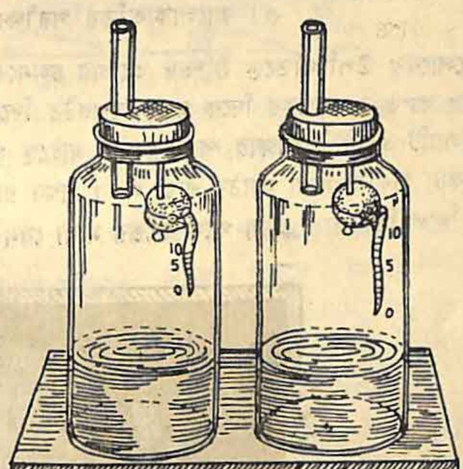
বিভিন্ন যন্ত্রের মধ্যে আর্ক-ইণ্ডিকেটর যন্ত্রের সাহায্যে গাছের বৃদ্ধি খুব সহজে পরীক্ষা করা যায়। আর্ক-ইণ্ডিকেটর যন্ত্র স্ট্যাণ্ডে আটকান একটি বড় কোণ পরিমাপক যন্ত্রের মত। ইহার বৃত্তচাপ অংশটি একটি মাপনী। ইহার

কেন্দ্রে অবস্থিত কপির সঙ্গে একটি লম্বা নির্দেশক লাগান থাকে। নির্দেশকের প্রান্তভাগ মাপনীর দাগগুলির উপর থাকে।

যে গাছের বৃদ্ধি পরীক্ষা করা হয় উহার কাণ্ডের আগায় একটি দড়ি বাঁধা হয়। দড়িটিকে কপির উপর দিয়া লইয়া অপর প্রান্তে একটি ভার ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। পরীক্ষার সুরুতে নির্দেশককে ভূমির সমান্তরাল করিয়া রাখা হয়। এইভাবে কয়েকদিন রাখিলে কাণ্ডটি যখন দৈর্ঘ্যে বাড়িবে, দড়ির অপর



স্পেস মার্কার চক্র



মূলের বৃদ্ধির পরীক্ষা

প্রান্তের ভার নীচের দিকে নামিবে এবং দড়ির টানে কপি ধীরে ধীরে ঘুরিলে নির্দেশক নীচের দিকে নামিতে থাকিবে। নির্দেশকটি চব্বিশ ঘণ্টায় কত সেণ্টিমিটার পার হইল তাহা দেখিয়া গাছটি এক ঘণ্টায় কতখানি বাড়ে তা নির্ণয় করা যায়।

২। মূল ও কাণ্ডের সকল অংশে বৃদ্ধির হার সমান নহে

উদ্ভিদের কাণ্ড বা মূলের সকল অংশ সমানভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। কোন কোন অংশে বৃদ্ধির হার খুব বেশী আবার কোথাও কম। ইহা একটি পরীক্ষার দ্বারা দেখান যাইতে পারে। স্পেস-মার্কার চক্রে কালি মাখাইয়া অঙ্কুরিত ছোলা বা মটর বীজের মূলে দাগ দেওয়া হইল। স্পেস-মার্কার চক্রে দাগগুলি সমান ব্যবধানে থাকায় মূলেও ঠিক ঐভাবে দাগগুলি পড়িবে।

এইবার মূল নীচের দিকে রাখিয়া বীজটিকে আলপিন দ্বারা একটি ছোট কাষ্ঠখণ্ডে আটকাইয়া উহাকে একটি বড় মুখওয়ালা বোতলের মধ্যে রাখা হইল। বোতলের মধ্যে খানিকটা জল লওয়া হইল। এইভাবে কয়েকদিন রাখিলে দেখা যাইবে মূলত্রের উপরে যে দাগগুলি ছিল তাহাদের ব্যবধান পূর্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে। বীজপত্রের দিকে দাগগুলির ব্যবধান কম বাড়িয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় মূলের সর্বত্র বৃদ্ধির হার সমান নহে।

৩। আলোকাবৃত্তির পরীক্ষা

আলোকের উপস্থিতিতে উদ্ভিদ অংগের চলনকে **আলোকাবৃত্তি** বলে। উদ্ভিদের কাণ্ড আলোকের দিকে মূল বিপরীত দিকে বর্ধিত হয়। আলোকাবৃত্তি চলনটি একটি পরীক্ষার দ্বারা দেখান যাইতে পারে। একদিকে বড় ছিদ্রযুক্ত একটা ঢাকনাওয়ালা কাঠের বাক্স লও। লক্ষ্য রাখিতে হইবে, ঢাকনা বন্ধ করিয়া দিলে ছিদ্র ছাড়া অন্য পথে বাক্সের মধ্যে যেন আলো প্রবেশ করিতে না



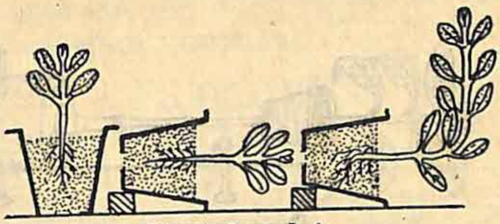
আলোকাবৃত্তির পরীক্ষা

পারে। চারাগাছ সমেত একটি ছোট টব বাক্সের মধ্যে বসাইয়া ঢাকনা বন্ধ করিয়া দাও। এইবার টব সমেত বাক্স আলোকিত স্থানে রাখিয়া দাও।

কয়েকদিন পর বাক্সের ঢাকনা খুলিয়া টবটি বাহির কর। দেখিবে চারা গাছের কাণ্ড বাঁকিয়া গিয়াছে। ছিদ্র দিয়া বাক্সের মধ্যে আলো প্রবেশ করায় চারা গাছের কাণ্ড আলোর দিকে বাঁকিয়াছে। চারা গাছটি সাবধানে টবের মাটি হইতে বাহির করিয়া আনিলে উহার মূল কাণ্ডের বিপরীত দিকে বাঁকিয়াছে দেখিতে পাইবে।

৪। অভিকর্ষাবৃত্তির পরীক্ষা

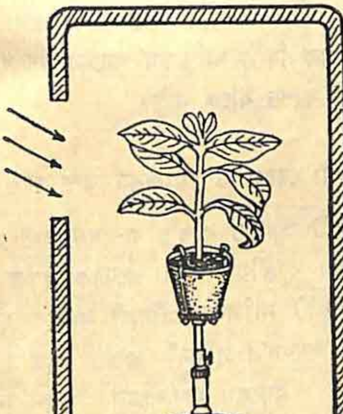
গাছকে যে কোন অবস্থায় রাখা যাক না কেন মূল সর্বদা নীচের দিকে ও কান্ড উপর দিকে বর্ধিত হয়। পৃথিবীর অভিকর্ষ শক্তির প্রভাবে উহাদের এইরূপ বিচলন ঘটে। চারা গাছ সমেত একটি টবকে (ছবির মত) মেঝেতে



অভিকর্ষাবৃত্তির পরীক্ষা

শোয়াইয়া ঐ অবস্থায় কয়েকদিন রাখিয়া দাও। দেখিবে কান্ড বাঁকিয়া উপর দিকে উঠিয়াছে এবং মাটির ভিতরে প্রধান মূল বাঁকিয়া নীচের দিকে নামিয়াছে।

৫। যন্ত্রের দ্বারা আলোক ও অভিকর্ষের প্রভাবকে অগ্রাহ্য করা যায়

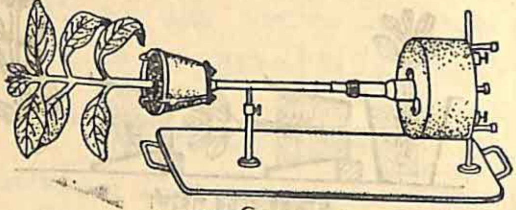


ক্লাইনোস্ট্যাট

টবের গাছকে ক্লাইনোস্ট্যাট যন্ত্রে বসাইয়া যন্ত্রটি চালু করিলে আলোক বা অভিকর্ষ গাছটির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। ক্লাইনোস্ট্যাটের নীচের দিক প্রকৃত পক্ষে একটি ঘড়ির মত যন্ত্র। ঘড়ির কেন্দ্রে যে অক্ষে সেকেন্ডের কাঁটা আটকান থাকে, এখানে সেই অক্ষটি বেশ লম্বা ও মজবুত। লম্বা অক্ষের মাথায় টব বসাইবার জন্য ক্লিপ সমেত একটি থালা আছে। যন্ত্রে দম দিলে অক্ষে আটকান থালাটি প্রতি মিনিটে একবার আবর্তিত হয়। চারা গাছ সমেত টব বসাইলে গাছটিও প্রতি মিনিটে একবার আবর্তিত হইবে। ক্লাইনোস্ট্যাট যন্ত্রটিকে খাড়াভাবে অথবা অনুভূমিকভাবে রাখা যায়।

চারা গাছ সমেত টব ক্লাইনোস্ট্যাট যন্ত্রে বসাও। যন্ত্রটি চালু করিয়া ছিদ্রযুক্ত কাঠের বাক্সের মধ্যে রাখিয়া ঢাকনা বন্ধ কর এবং পূর্বের ন্যায় বাক্সটি আলোকিত স্থানে রাখিয়া দাও। কয়েকদিন পর দেখিবে গাছটির মূল ও কান্ড

বাঁকিয়া যায় নাই বরং সোজা রহিয়াছে। ইহার কারণ কি? ? গাছটি আবর্তিত হইতে থাকায় আলোক মূল ও কাণ্ডের কোন একটি অংশে বেশীক্ষণ আপতিত হইতে পারে নাই; প্রতি মুহূর্তে নূতন নূতন অংশ আলোকের দিকে আসে। গাছের কোন একটি অংশ অল্পক্ষণ আলোকিত থাকায় আলোক কাণ্ড বা মূলের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।



অনুভূমিকভাবে রাখা ক্লাইনোস্ট্যাট

গাছ সমেত ক্লাইনোস্ট্যাট যন্ত্রকে অনুভূমিকভাবে বসাও এবং যন্ত্রটি চালু কর। কয়েকদিন পর লক্ষ্য করিলে দেখিবে টবের গাছটি আগের মত মাটির সমান্তরাল অবস্থায় রহিয়াছে; অভিকর্ষের প্রভাবে বাঁকিয়া যায় নাই। গাছটি আবর্তিত হইতে থাকায় প্রতি মুহূর্তে গাছের সম্পূর্ণ অক্ষের বিভিন্ন দিক অভিকর্ষের সম্মুখীন হয়। গাছের কোন এক দিকে অভিকর্ষ অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রভাব বিস্তার করিতে না পারায় মূল বা কাণ্ড বাঁকে নাই।

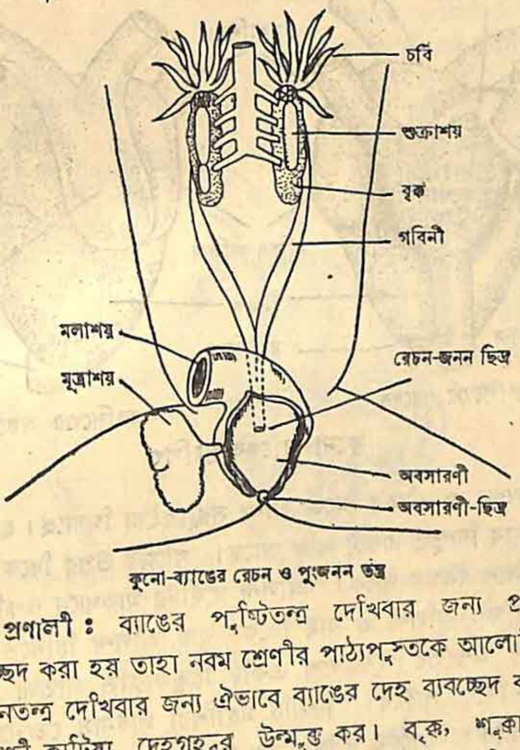
৬। কুনো-ব্যাঙের দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া রেচন ও পুংজনন তন্ত্র দেখ

রেচন তন্ত্র ঃ কুনো-ব্যাঙের **বৃক্ক** দুইটি লালচে বর্ণের লম্বাটে যন্ত্র এবং দেহ-গহ্বরে পিঠের দিকে আটকান থাকে। বৃক্কীয় ধমনী প্রত্যেক বৃক্কে রক্ত সরবরাহ করে। প্রত্যেক বৃক্ক হইতে একটি নালিকা—**গবিনী** বাহির হইয়া দেহের পিছন দিকে অগ্রসর হয়। দুই পার্শ্বের গবিনী একত্রে যুক্ত হইয়া **রেচন-ছিদ্র** দিয়া **অবসারণীতে** উন্মুক্ত হয়। ব্যাঙের মলাশয়ের পিছন দিকে একটি ছোট কক্ষ আছে। ইহাকে **অবসারনী** বলে। রেচন-ছিদ্র, মলাশয়, মূত্রাশয় অবসারণীতে উন্মুক্ত হয়। মূত্রাশয়টি খুব পাতলা থলির মত। অবসারণী একটি ছিদ্র দিয়া বাহিরে উন্মুক্ত হয়। এই ছিদ্রকে অবসারণী-ছিদ্র বলে।

বৃক্ক হইতে দূষিত তরল পদার্থ গবিনীর ভিতর দিয়া অবসারণীতে আসে। মূত্র অবসারণী-ছিদ্র দিয়া বাহিরে পরিত্যক্ত হইতে পারে অথবা সাময়িকভাবে মূত্রাশয়ে সঞ্চিত থাকিতে পারে।

পুরুষ ব্যাঙের জনন তন্ত্র ঃ কুনো-ব্যাঙের রেচন তন্ত্র ও জনন তন্ত্র পৃথক

হইলেও এই দুই তন্ত্র অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পুরুষ ব্যাঙের জনন তন্ত্রে এক-জোড়া লম্বাটে শুক্রাশয় আছে। শুক্রাশয় বৃক্কের অঙ্কদেশে আটকান থাকে। শুক্রাশয়ের মধ্যে শুক্রাণু উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক শুক্রাশয় হইতে সূক্ষ্ম নালিকা বাহির হইয়া সেই পার্শ্বের গবিনীতে উন্মুক্ত হয়। শুক্রাণু এবং মূত্র, এই উভয় প্রকার পদার্থ গবিনীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া অবসারণীতে চলিয়া আসে। পুরুষ ব্যাঙের দেহে রেচন-ছিদ্র ও জনন-ছিদ্র এক। অর্থাৎ একই ছিদ্র দিয়া শুক্রাণু ও মূত্র বাহিরে পরিত্যক্ত হয়।



কুনো-ব্যাঙের রেচন ও পুংজনন তন্ত্র

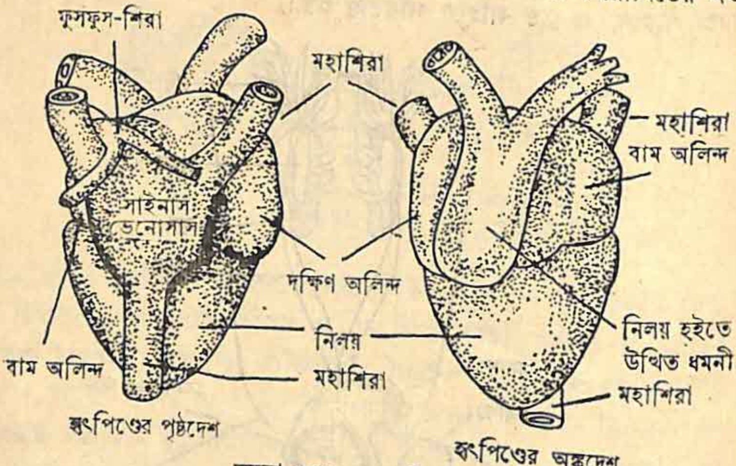
ব্যবচ্ছেদ প্রণালী : ব্যাঙের পৌষ্টিকতন্ত্র দেখিবার জন্য প্রাণীটির দেহ যেভাবে ব্যবচ্ছেদ করা হয় তাহা নবম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। রেচন ও জননতন্ত্র দেখিবার জন্য ঐভাবে ব্যাঙের দেহ ব্যবচ্ছেদ করিতে হইবে। চামড়া ও পেশী কাটিয়া দেহগহ্বর উন্মুক্ত কর। বৃক্ক, শুক্রাশয়, গবিনী, মূত্রাশয় ও অবসারণীকে অক্ষত রাখিয়া দেহের অন্যান্য যন্ত্রগুলি কাটিয়া ফেল। রেচন ও জনন তন্ত্রের বিভিন্ন অংশ বুরুশ দিয়া পরিষ্কার করিয়া ট্রে-এর জল পরিবর্তন কর। ছবি আঁকিয়া প্রত্যেক অংশ লেবেল কর।

৭। কুনো-ব্যাঙের হৃৎপিণ্ড ও খিলান ধমনীগুলি দেখ

ব্যবচ্ছেদ প্রণালী : ক্লোরোফর্ম করা ব্যাঙকে নিয়মমত রাখিয়া ট্রে-তে জল দাও। আগের মত চামড়া ও পেশী কাটিয়া দেহগহ্বর উন্মুক্ত কর। লক্ষ্য রাখিবে কাটিবার সময়ে দেহের কোন অংশ যেন যন্ত্রের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত না

হয়। হৃৎপিণ্ড, বা অন্যান্য যন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইলে রক্ত বাহির হইতে থাকিবে। হৃৎপিণ্ড একটি পাতলা আবরণ—পেরিকার্ডিয়াম দ্বারা আবৃত। চিমটা ও কাঁচির দ্বারা খুব সাবধানে উহাকে তুলিয়া ফেল। হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন ও প্রসারণ ভালভাবে দেখিতে পাইবে। এইবার হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন অংশ ও হৃৎপিণ্ড হইতে বহির্গত প্রধান ধমনীগুলি দেখিতে সুরু কর।

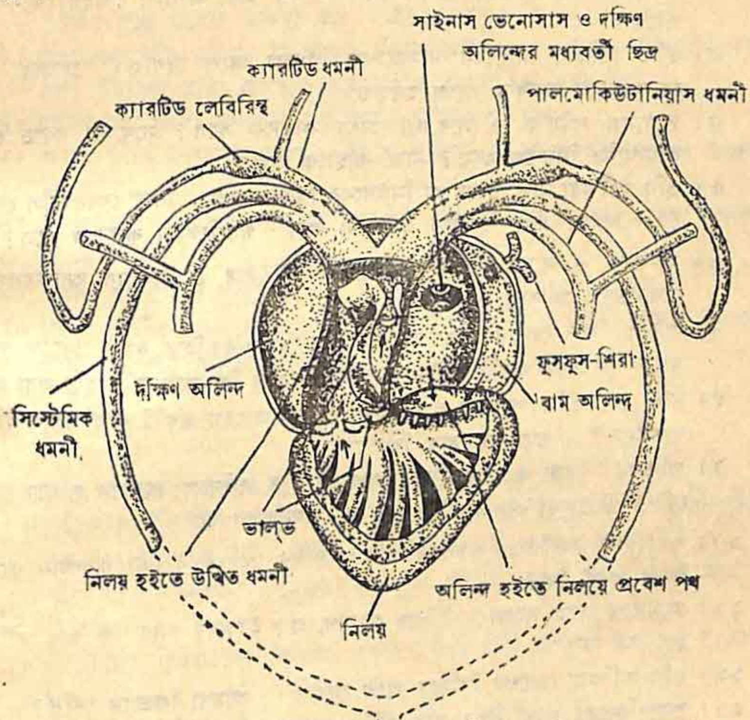
পর্যবেক্ষণ-ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডের আকৃতি অনেকটা উল্টা পিরামিডের মত।



কুনো-ব্যাঙের হৃৎপিণ্ড

উপর দিক চওড়া ও নীচের দিকে ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে। হৃৎপিণ্ডের উপর আড়াআড়িভাবে বিস্তৃত একটা খাঁজ আছে। খাঁজের উপর দিকে দুইটি অলিন্দ ও নীচের অংশে নিলয় থাকে। অলিন্দ দুইটির মাঝখানে একটি খাঁজ থাকায় ডানদিকের দক্ষিণ অলিন্দ ও বাম দিকের বাম অলিন্দ চিনিতে অসুবিধা হয় না। অলিন্দ অঞ্চলের পৃষ্ঠদেশে একটি ত্রিভুজাকৃতি পাতলা থলি—সাইনাস ভেনোসাস দেখিতে পাইবে। তিনটি মহাশিরা সাইনাস ভেনোসাসের তিনটি কোণে যুক্ত থাকে। দেহের দূষিত রক্ত মহাশিরা বাহিয়া সাইনাস ভেনোসাসে আসিয়া হৃৎপিণ্ডে প্রবেশের জন্য অপেক্ষা করে। সাইনাস ভেনোসাস ও দক্ষিণ অলিন্দের মাঝখানে ছিদ্র দিয়া রক্ত সাইনাস হইতে দক্ষিণ অলিন্দে প্রবেশ করে। ফুসফুস হইতে আগত ফুসফুস-শিরা বাম অলিন্দে পৃষ্ঠদেশে উহার সহিত যুক্ত থাকে। এই শিরাটি ফুসফুস হইতে বাম অলিন্দে রক্ত প্রেরণ করে। হৃৎপিণ্ডের নীচের অংশটি নিলয়। দুই অলিন্দের রক্ত একটি ছিদ্র দিয়া নিলয়ে প্রবেশ করে। অলিন্দের অঙ্কদেশে, নিলয় হইতে উত্থিত একটি মোটা ধমনী দেখিতে পাইবে। একটু উপরে উঠিয়া এই ধমনীটি দুইভাগে বিভক্ত হয়। ইহার একটি শাখা বামদিকে ও অপরটি ডানদিকে থাকে। প্রত্যেক শাখা হইতে

তিনটি প্রধান ধমনী—ক্যারটিড, সিস্টেমিক ও পালমোকিউটানিয়াস উৎপন্ন হয়। ধমনীগুলি খিলানের মত বাঁকা থাকে। তাই ইহাদের **খিলান ধমনী** বলা হয়। লক্ষ্য করিয়া দেখ, **ক্যারটিড ধমনী মাথার** দিকে অগ্রসর হয় এবং দুইটি শাখায় বিভক্ত হয়। বিভক্ত হইবার ঠিক পরে প্রধান ক্যারটিড ধমনীতে একটি স্ফীত অংশ দেখা যায়। ইহাকে **ক্যারটিড লেবিরিন্থ** বলা হয়। ইহার মধ্যে ধমনীটি রক্তজালকে পরিণত হয় এবং নালিকাগুলি পুনরায় মিলিত



লম্বচ্ছেদে কুনো-ব্যাঙের হৃৎপিণ্ড এবং ইহা হইতে উত্থিত খিলান-ধমনী

হইয়া ধমনীরূপে বাহির হয়। ক্যারটিড ধমনী মাথায় রক্ত প্রেরণ করে। লেবিরিন্থের রক্তজালক দ্রুত রক্তপ্রবাহের পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং দুইটি শাখায় সমানভাবে রক্ত প্রেরণ করে।

দুই পার্শ্বের সিস্টেমিক শাখা অন্ননালীর দুই পার্শ্ব দিয়া এবং উহাকে বেষ্টন করিয়া পৃষ্ঠদেশে আসে। এই স্থানে শাখা দুইটি মিলিত হইয়া পৃষ্ঠ-মহাধমনী নামে এক ধমনীতে পরিণত হয়। ইহা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া দেহের অন্যান্য অংশে রক্ত সরবরাহ করে।

পালমোকিউটানিয়াস ধমনী গাত্রচর্মে ও ফুসফুসে রক্ত প্রেরণ করে।

অনুশীলনী

প্রথম অধ্যায়

১। নার্ভ তন্ত্র কি কি কাজে আমাদের সাহায্য করে?

২। মানুষের নার্ভ তন্ত্রের প্রধান অংশ কি কি এবং ঐগুলি দেহের কোনস্থানে থাকে?

৩। ছবি আঁকিয়া মানুষের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ দেখাও। প্রত্যেক অংশ কোন কোন কার্যের সঙ্গে জড়িত?

৪। সুষুম্না শীর্ষক ও সুষুম্না কান্ড কাহাকে বলে? সুষুম্না কান্ড কোন কার্যগুলি নিয়ন্ত্রণ করে? নার্ভ কাহাকে বলে?

৫। ছবি আঁকিয়া নার্ভ কোষ বা নিউরনের বিবরণ দাও। নার্ভ কোষগুলি দেহের কোন স্থানে এবং কিভাবে অবস্থান করে? গ্যাংগ্লিয়ন কাহাকে বলে?

৬। মস্তিষ্ক ও সুষুম্না কান্ডের মধ্যে নার্ভ কোষ ও উহাদের অ্যাকসনগুলি কেমনভাবে সজ্জিত থাকে?

৭। আবেগ কি? দেহের মধ্যে আবেগ কিভাবে পরিবাহিত হয়? আবেগ পরিবহনে কম পক্ষে কয়টি নিউরন থাকে? উহাদের কি নামে অভিহিত করা হয়?

৮। নার্ভ কোষগুলি পরস্পর যুক্ত না থাকিলেও আবেগ একটি নার্ভ কোষ হইতে পার্শ্ববর্তী নার্ভকোষে যায় কিভাবে?

৯। প্রতিবর্তী ক্রিয়া কাহাকে বলে? আগুনে হাত লাগিলে তৎক্ষণাৎ সরিয়া আসে কেন? উত্তেজনা অনুযায়ী এই কাজ কেমনভাবে ঘটে?

১০। স্বতঃক্রিয় নার্ভ তন্ত্র কাহাকে বলে? দেহের কোনখানে ইহা অবস্থান করে? ইহার কার্য কি?

১১। আমাদের দেহে সংজ্ঞাবহ ইন্দ্রিয় কোনগুলি? ইহাদের দ্বারা কি কার্য সাধিত হয়?

১২। ছবি আঁকিয়া চোখের বিভিন্ন অংশ দেখাও। আমরা কিভাবে দেখি?

১৩। শ্রবণেন্দ্রিয়ের কার্য কি? ছবি আঁকিয়া মানুষের শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিভিন্ন অংশ দেখাও। প্রত্যেক অংশ একত্রে মিলিয়া কিভাবে শ্রবণে সাহায্য করে?

১৪। পতঙ্গ কি শব্দ শুনিতে পায়? পতঙ্গের চোখ ও মানুষের চোখের মধ্যে পার্থক্য কি?

১৫। গাত্রচর্ম দিয়া আমরা স্পর্শ, বেদনা, উত্তাপ, শৈত্য অনুভব করিতে পারি কেন? প্রান্তাঙ্গ কাহাকে বলে? গাত্রচর্মের যে কোন একটি বিন্দু দিয়া তাপ এবং শৈত্য অনুভব করা যায় না কেন?

১৬। ঘ্রাণ ও স্বাদ দেহের কোন্ কোন্ অঙ্গের দ্বারা অনুভব করা যায়? এই দুই অনুভূতি কি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত? তোমার উত্তরের সমর্থনে উদাহরণ দাও। টেস্টবাড কাহাকে বলে?

১৭। কেঁচো ও চিংড়ির নার্ভ তন্ত্রে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি আলোচনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। হরমোন কাহাকে বলে? কোন কোন জীবদেহে পাওয়া যায়? উদ্ভিদদেহে উৎপন্ন হরমোনের নাম কি এবং উহা কোথায় উৎপন্ন হয়?
২। অক্সিন কি কেবল উদ্ভিদের বৃদ্ধির নিয়ামক? ট্রপিক চলনের মূলে অক্সিনের প্রভাব আছে কি?
৩। অক্সিন উদ্ভিদের বৃদ্ধি ঘটায় তাহা কেমন করিয়া বুঝা যায়?
৪। মূলাবরণীর মাথা কাটিয়া মূলের কর্তিত আগায় বসাইয়া দিলে মূলের বৃদ্ধির হার অনেক কমিয়া যায়। ইহার কারণ কি?
৫। প্রাণীদেহে গ্রন্থি বলিতে কি বুঝায়? গ্রন্থি হইতে কত রকমের পদার্থ নিঃসৃত হয়? ইহাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কোনগুলি এবং কেন?
৬। মানবদেহের গ্রন্থি প্রধানতঃ কয় প্রকার? উদাহরণ দাও।
৭। অনাল গ্রন্থি কাহাকে বলে? ইহার সহিত পরিপাক গ্রন্থিগুলির প্রভেদ কি?
৮। মানবদেহের অনাল গ্রন্থিগুলির নাম বল। ইহারা দেহের কোন্ কোন্ স্থানে অবস্থান করে?
৯। অনাল গ্রন্থিগুলি হইতে ক্ষরিত হরমোনের কার্য আলোচনা কর।
১০। কোন প্রাণীর হাবভাব, চাল-চলন নির্ভর করে উহার নার্ভ তন্ত্রের উপর। মানুষের ক্ষেত্রে কি এই কথা প্রযোজ্য?

তৃতীয় অধ্যায়

১। কোষ বিভাজন কাহাকে বলে? ইহার উদ্দেশ্য কি?
২। মাইটোসিস বিভাজন কাহাকে বলে? উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের কোন্ কোষগুলি এই পন্থায় বিভক্ত হয়? মাইটোসিস বিভাজনের উদ্দেশ্য কি?
৩। ছবি আঁকিয়া একটি ক্রোমোজোমের গঠন বর্ণনা কর। ক্রোমোজোম কোথায় থাকে?
৪। মাইটোসিস বিভাজনের বিভিন্ন অবস্থাগুলির ছবি আঁকিয়া উহাদের বিবরণ দাও।
৫। জনন কোষ বলিতে কি বুঝায়? উহা কোন পদ্ধতিতে বিভক্ত হয়?
৬। মাইটোসিস ও মায়োসিসে প্রভেদ কি? মাইটোসিসকে সম-বিভাজন ও মায়োসিসকে লঘুকরণ বিভাজন বলা হয় কেন?
৭। মায়োসিস বিভাজনের উদ্দেশ্য কি?
৮। মায়োসিসের প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাজনের বিভিন্ন অবস্থাগুলি ছবি সহযোগে আলোচনা কর।
৯। দেহকোষ ও জননকোষে প্রোটোপ্লাজমের বিভাজন ঘটে কিভাবে?

চতুর্থ অধ্যায়

১। বৃদ্ধি কাহাকে বলে? জীব-বিজ্ঞানী বৃদ্ধি বলিতে কি বোঝেন?
২। উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য কোন্ কোন্ জিনিসের প্রয়োজন আছে?

৩। গাছের বৃদ্ধির জন্য জল, অক্সিজেন, তাপ, আলোক ও হরমোনের প্রয়োজন হয় কেন?
৪। আমাদের বৃদ্ধি কত দিনে সম্পূর্ণ হয় এবং কাহার উপর নির্ভর করে?

পঞ্চম অধ্যায়

১। জনন কাহাকে বলে? উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতে কত রকমের জনন পদ্ধতি দেখা যায়?
২। কোন্ কোন্ জীব কোষ বিভাজন দ্বারা বংশ বিস্তার করে? ঈষ্ট এবং অ্যামিবার কোষ বিভাজন হয় কিভাবে?
৩। কোন্ কোন্ উদ্ভিদ রেণু দ্বারা বংশ বিস্তার করে?
৪। রেণু কাহাকে বলে? ছত্রাক, শৈবাল, মস ও ফার্নের কোন্ অংশে রেণু উৎপন্ন হয়?
৫। মিউকর, ইউলোথ্রিক্স্, মস ও ফার্নের রেণুস্থলী অঙ্কন কর।
৬। ছত্রাক, শৈবাল, মস ও ফার্নের রেণু অঙ্কুরিত হইয়া কোন্ উদ্ভিদের জন্ম দেয়?
৭। অঙ্গজ জনন বলিতে কি বুঝায়? উদাহরণ দাও।
৮। উদ্ভিদজগতে কত রকমের অঙ্গজ জনন দেখা যায়?
৯। অঙ্গজ জনন কি কেবল উদ্ভিদজগতে সীমাবদ্ধ? উত্তরের সমর্থনে উদাহরণ দাও।
১০। অযৌন ও যৌন জননে প্রভেদ কি?
১১। সপুষ্পক উদ্ভিদে যৌন জনন পদ্ধতি বর্ণনা কর।
১২। শুক্রাণু ও ডিম্বাণু কাহাকে বলে? সপুষ্পক উদ্ভিদে ইহারা কোথায় উৎপন্ন হয়?
১৩। পরাগ নালিকা কি এবং কি কার্য করে? জনন মাতৃকোষ কোন পদ্ধতিতে বিভক্ত হইয়া শুক্রাণু ও ডিম্বাণু সৃষ্টি করে?
১৪। পরাগ যোগ কাহাকে বলে? পরাগ যোগের প্রয়োজনীয়তা কি?
১৫। মসের যৌন জনন কিভাবে ঘটে? সব মস গাছের মাথায় কি রেণুস্থলী জন্মায়? ইহার কারণ কি?
১৬। মস ও ফার্ণের লিঙ্গধর উদ্ভিদে প্রভেদ কি?
১৭। শৈবালের যৌন জনন কি ধরণের হয়?

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। বংশগতি কাহাকে বলে? বংশগতির কথা বলিলে সর্বাগ্রে কাহার নাম মনে আসে?
২। মেন্ডেল কেন মটর গাছ লইয়া পরীক্ষা সুরু করেন?
৩। স্বপরাগ যোগ ও কৃত্রিম প্রজননে প্রভেদ কি?
৪। প্রকৃত লম্বা, প্রকৃত খর্ব ও সংকর গাছ বলিতে কি বুঝায়?
৫। প্রকৃত লম্বা ও প্রকৃত খর্ব গাছের সংমিশ্রণে প্রথম পুরুষে কি ধরণের গাছ পাওয়া যায়? কেন এইরূপ ঘটে?

৬। প্রকট বৈশিষ্ট্য ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য কাহাকে বলে? জীবের মধ্যে কোনটি প্রকট বৈশিষ্ট্য ও কোনটি প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য তাহা কিভাবে নির্ণয় করা যায়?

৭। মটর গাছ লইয়া মেন্ডেলের প্রথম পরীক্ষা বর্ণনা কর।

৮। প্রথম পরীক্ষা ও দ্বিতীয় পরীক্ষায় মেন্ডেল কয় জোড়া বৈশিষ্ট্য লইয়াছিলেন? উহাদের মিলনে প্রথম ও দ্বিতীয় পুরুষে কি ফল পাওয়া গেল?

৯। প্রথম ও দ্বিতীয় পরীক্ষার ফল হইতে মেন্ডেল বংশগতির যে সূত্রগুলি আবিষ্কার করেন তাহা আলোচনা কর।

১০। মেন্ডেলের পরীক্ষা যে নির্ভুল তাহা কিভাবে প্রমাণ করা যায়?

১১। প্রকট বৈশিষ্ট্য যে সব সময়ে সম্পূর্ণভাবে প্রভাবশালী তাহা নহে— উদাহরণ সহযোগে বুঝাইয়া দাও।

সপ্তম অধ্যায়

১। জীবাশ্ম কাহাকে বলে? কোথায় পাওয়া যায়? কেমনভাবে সৃষ্টি হয়?

২। জীব-অভিব্যক্তি কি? প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে জীবজগত কিভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে তাহার বিবরণ দাও।

৩। মেরুদণ্ডী প্রাণীর আবির্ভাব কবে হইয়াছিল? সরীসৃপ যুগের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রাণীর নাম বল।

৪। আধুনিক পাখীর উৎপত্তি সরীসৃপ হইতে হইয়াছে— ইহার প্রমাণ কি?

৫। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে কবে?

৬। জীব-অভিব্যক্তির সপক্ষে আর কি কি প্রমাণ আছে?

৭। মেরুদণ্ডী প্রাণীগুলি যে মৎস্যজাতীয় প্রাণী হইতে আসিয়াছে তাহা কিভাবে প্রমাণিত হয়?

৮। একবীজপত্রী উদ্ভিদ যে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ হইতে আসিয়াছে ইহার প্রমাণ কি?

৯। জীবের নিষ্ক্রিয় অঙ্গগুলি কি জীব-অভিব্যক্তি সমর্থন করে?

অষ্টম অধ্যায়

১। অভিযোজন কি? উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

২। অভিযোজনের প্রয়োজনীয়তা কি? অভিযোজনের অভাবে জীবের কি অসুবিধা হয়?

৩। স্থলবাসী উদ্ভিদদেহে কি কি অভিযোজন দেখা যায়?

৪। ঘোড়া, পাখী, ইঁদুরের দেহে অভিযোজনগুলি আলোচনা কর।

৫। আত্মরক্ষার জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণী কি পন্থা অবলম্বন করে?

৬। বর্ণ অভিযোজন দ্বারা উদ্ভিদ ও প্রাণী কি কি কার্য করে তাহা বল।

৭। মরু উদ্ভিদ কিভাবে অতিরিক্ত বাষ্পমোচন বন্ধ রাখে?

৮। রুই মাছ স্বচ্ছন্দে জলে বাস করে। ইহার কারণ কি?

৯। জলজ উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড ও পাতায় কি কি অভিযোজন দেখা যায়?

১০। শিঙ্গী, মাগুর, কই অল্প জলে অনেকদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে। ইহার কারণ কি?
১১। খাদ্য গ্রহণের জন্য প্রাণীদেহে কি কি অভিযোজন দেখা যায়?
১২। পরজীবিতা দেহের অবনতি ঘটায়— ইহা কি সত্য?

নবম অধ্যায়

১। জীবসমাজ বলিতে কি বুঝায়?
২। বনভূমির মধ্যে জীব সমাজের উদ্ভিদ ও প্রাণীগুলি কিভাবে একে অন্যের উপর নির্ভর করে তাহা বর্ণনা কর।
৩। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা কর—
(ক) বনভূমির জীব সমাজে বাসস্থানের জন্য একে অন্যের উপর নির্ভরশীল।
(খ) খাদ্য-শৃঙ্খল।
(গ) প্রাকৃতিক ভারসাম্য ব্যবস্থা।
৪। জীব সমাজের খন্ডাংশ যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে উহার ফল কি দাঁড়াইবে? উদাহরণ সহযোগে আলোচনা কর।

দশম অধ্যায়

১। প্রকৃতি সংরক্ষণ বলিতে কি বুঝায়?
২। বন সম্পদ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়? ইহাকে রক্ষা করিবার উপায় কি?
৩। কি কি কারণে মৃত্তিকা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়? মৃত্তিকার অবক্ষয় বন্ধ করিবার প্রয়োজন কি? কিভাবে মৃত্তিকা সংরক্ষণ করা যায়?
৪। বন্য প্রাণী ও মৎস্যের সংখ্যা কমিয়া যাইবার কারণ কি? কিভাবে ইহাদের রক্ষা করা যায়?
৫। সংরক্ষণের অভাবে আমাদের দেশ হইতে কোন কোন প্রাণী নিশ্চিহ্ন হইতে চলিয়াছে?
৬। পরিকল্পনাহীন সংরক্ষণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়—ইহার কারণ কি?
৭। প্রকৃতিকে আদিম অবস্থায় ফিরাইয়া না আনিলে প্রকৃতির ভান্ডার শূন্য হইবে—এই উক্তির যথার্থতা প্রমাণ কর।

একাদশ অধ্যায়

১। বায়ুমন্ডলের কার্বন কিভাবে উদ্ভিদ হইতে প্রাণীতে এবং প্রাণী হইতে উদ্ভিদে প্রবেশ করে তাহা ছকের সাহায্যে দেখাইয়া বর্ণনা কর।
২। কার্বন সাময়িকভাবে জীবদেহে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। উদাহরণ দ্বারা ইহা বুঝাইয়া দাও।
৩। ছবি আঁকিয়া অক্সিজেন-চক্র বর্ণনা কর।
৪। কোন কোন জীব বায়ুমন্ডলের নাইট্রোজেন ব্যবহার করিতে পারে?
৫। নাইট্রোজেন কিভাবে জীবদেহে প্রবেশ করিয়া পরে বাহির হইয়া আসে তাহা দেখাও।
৬। কার্বন-চক্র ও নাইট্রোজেন-চক্র অনেকগুলি ছোট ছোট চক্রের সমষ্টি। কতগুলি চক্র একসঙ্গে কার্যরত থাকে তাহা দেখাও।